

# ধর্ম-শিক্ষা

শক্তিবাদ প্রবর্তক

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রকাশক এবং পরিবেশক :  
<http://www.shaktibad.net>

ইন্টারনেট সংস্করণ :  
জানুয়ারী ১৪, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ

এই পুস্তক সর্বমানবের জন্য উন্মুক্ত।  
মূলকে বিকৃত না করে এর প্রচার সর্বথা প্রশংসনীয়।

## প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর প্রবর্তিত শক্তিবাদ ধর্ম আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা। আমরা বিশ্বাস করি, যদি ভারতকে আবার জগৎসভায় হত আসন ফিরে পেতে হয়, শক্তিবাদই একমাত্র পন্থা। তাই স্বামীজীর রচনাবলীর রক্ষণ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আমরা সামর্থ্যমত কাজ করে চলেছি এবং এই লক্ষ্যে তাঁর রচনাবলীর এক বিশুদ্ধ সংস্করণ আমরা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। এই “ধর্ম-শিক্ষা” গ্রন্থ সেই উদ্যোগেরই ফলশ্রুতি।

শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী আমাদের কাছে সাহিত্য গ্রন্থ বা নীতিকথার পাঠ নয়, বরং এক বিজ্ঞান - মানুষের বিকাশের বিজ্ঞান। বিজ্ঞান গ্রন্থের মত এর প্রত্যেকটি বাক্যের সত্যতা নিরীক্ষণপূর্বক মননই শক্তিবাদে প্রবেশের একমাত্র পথ। অবশ্যই মননের সীমারেখা আছে। তাই নিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ শক্তিবাদীয় উপাসনা এবং নিজের জীবনে অধীত সত্যকে প্রয়োগ করার নিরন্তর প্রয়াস না থাকলে একসময় শক্তিবাদ আমাদের জীবন থেকে লুপ্ত হতে বাধ্য।

যেহেতু এ এক বিজ্ঞান গ্রন্থ, তাই প্রথাগত সাহিত্য-দৃষ্টিতে একে মার্জিত করার কোন প্রয়াস আমরা করি নি, বরং স্বামীজীর লিখনশৈলী ও ভাষা আমরা যথাসম্ভব অটুট রেখেছি। প্রথাগত ব্যাকরণকে অস্বীকার করে স্বামীজীর ভাষার যে কোন বৈচিত্র্য আমরা “আর্ষপ্রয়োগ” হিসাবে মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু কালের গহন গতিতে আজ যাচাই করা অসম্ভব, কোনটা স্বামীজীর ইচ্ছাকৃত “আর্ষপ্রয়োগ” আর কোনটা বা “প্রেসের ভূত”। তাই ক্ষেত্রবিশেষে আমরা সামান্য পরিমার্জন ও সম্পাদনা করেছি। সম্পাদনা ও পরিমার্জন করার সময় যথাসম্ভব কম কলম চালানোর নীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে।

সমস্ত তৎসম ও ক্ষেত্রবিশেষে তদ্ভব শব্দের বানান মূলে অশুদ্ধ থাকলে, আমরা শুদ্ধ করে নিয়েছি। যেখানে বিভক্তিচিহ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বোঝাচ্ছে বা অর্থহীন ঠেকছে সেখানে আমরা যথাযথ পরিবর্তন করেছি। সর্বনাম পদ বাংলায় সম্মানসূচক (যেমন - ইনি, ইঁহাদের) ও সাধারণ (যেমন - এরা, ইহাদের) এই দুই রকম হয়ে থাকে। জিয়াপদও সেইমত গঠিত হয়। এই ব্যাপারে কোনও অসঙ্গতিকে আমরা যথাসম্ভব পরিমার্জিত করেছি। জিয়াপদ যেখানে কর্তৃবাচ্যের পরিবর্তে কর্মবাচ্যে আছে বা কর্মবাচ্যের পরিবর্তে কর্তৃবাচ্যে আছে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিধায় কোন কোন স্থানে আমরা ব্যাকরণ মারফিক পরিমার্জন করেছি। কিছু স্থানে যতিচিহ্নের কিছু পরিবর্তনও করা হয়েছে।

এর বাইরে আমরা যে কোন পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছি, সবই পাদটীকায় “প্রকাশকের নিবেদন” বলে প্রকাশ করেছি। “প্রকাশকের নিবেদন” বলা না থাকলে সেই সব পাদটীকা মূলগ্রন্থের অন্তর্গত।

মাননীয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে স্বামীজী এই গ্রন্থ আনুমানিক ত্রিশ বা চল্লিশের দশকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ধর্মবিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সহ শিক্ষাদানের জন্য লেখেন। বর্তমান সমাজে ধর্মবিষয়ে আমাদের সাধারণ জ্ঞান অত্যল্প। তাই যে কোন মানুষই এই গ্রন্থ অধ্যয়নে অশেষ উপকৃত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। মূল প্রথম সংস্করণ আজ দুর্লভ। তাই গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণই (প্রকাশকাল - বঙ্গাব্দ ১৩৮১ ইং ১৯৭৪ সন) আমাদের এই সংস্করণের ভিত্তি। সেই সময় অতি বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে এই বই প্রকাশিত হয়, তাই স্বামীজীর মূল রচনার সামান্য কিছু অঙ্গচ্ছেদ বা বিকৃতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভবিষ্যতে মূল সংস্করণ যদি আমাদের হাতে আসে তবে আমরা সেই ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস করব।

স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শক্তিবাদ ভারতের বৃক্কে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। সহস্র বছরের অনাচার দন্ধ ভারত আবার নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে পারবে। এই লক্ষ্যে যদি আমাদের প্রয়াস কণামাত্রও সাহায্য করে, আমরা আমাদের সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করব।

বিনীত -  
প্রকাশক

## পাঠকগণের প্রতি

ধর্মশিক্ষা পুস্তকখানা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা হিন্দু মাত্রই উপকৃত হইবেন। বহুদিন ধরিয়া আমাদের শিক্ষার মধ্যে ধর্মশিক্ষা অঙ্গীভূত না থাকিবার দরুণ আমরা নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ অনভিজ্ঞ থাকিয়া যাইতেছি। বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের সম্বন্ধে সমালোচনা করিলে আমরা উহার জবাব দেওয়ার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে আমরা সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। বহুদিন ধর্মের আলোচনা না থাকিবার দরুণ ধর্মের কোন বিজ্ঞানই আমরা আর বলিতে সক্ষম নহি। হিন্দুধর্ম অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ধর্ম। ধর্মের বিজ্ঞান ও দার্শনিক দিক সকলেরই জানা প্রয়োজন। ইহার কর্ম বিজ্ঞান, উপাসনা বিজ্ঞান ও দার্শনিকতা সবই যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুধর্মের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রহস্য উদ্ঘাটন সহ এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, কাজেই ইহা হিন্দুমাত্রেরই ধর্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করিবে। অহিন্দুরাও এই পুস্তক পাঠে ইহা ভাল ভাবেই বুঝিতে পারিবেন যে মানুষের কর্মধর্ম, উপাসনা ধর্ম ও জ্ঞানধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে এবং বিশ্বাসবাদ ধর্মকে ধর্মই বলা চলে না।

বিভিন্ন শ্রেণীর বা বয়সের বালক বালিকাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার ধর্ম গ্রন্থ না লিখিয়া একই গ্রন্থ রাখা হইয়াছে। মানব জীবনের মধ্যে সংস্কার এবং শিক্ষা এক অপূর্ব বস্তু। সংস্কার দ্বারাই মানুষ বর্কর, পশু ও অস্তর হয় এবং সংস্কারই মানুষকে শক্তিশালী দেবত্ব দান করে আর দুর্বল সংস্কার দ্বারা মানুষের মনোবৃত্তি দুর্বল হইয়া যায়। ধর্মশিক্ষা হিন্দু জাতিকে হিন্দুত্বের আদর্শে গড়িয়া তুলিবার একটা সংস্কার ধারা মাত্র। বিভিন্ন বয়সের ভাষাজ্ঞানের নকল করিলে কোন সংস্কারই সম্ভব হইবে না। বরং পুস্তকের ভার বহন করানো হইবে। নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যার্থীদিগকে প্রথমেই নিত্যকার উপাসনা বিধিতে প্রতিষ্ঠা করাইতে হইবে। ইহা যাহাতে নিত্য অনুষ্ঠিত হয় সে জন্য বিশেষভাবে পিতামাতা ও শিক্ষক প্রভৃতিকে সচেত্ব হইতে হইবে। পরে ধীরে ধীরে সব রহস্য বলিতে হইবে। প্রথম হইতে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত একই পুস্তক পাঠ্য হইবার দরুণ আলোচনা দ্বারাই ধর্মের সব রহস্য সব বয়সের বিদ্যার্থীদের আয়ত্তে আসিয়া যাইবে এবং হিন্দু সমাজের সব শাখাতে নিজেদের ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ফলে আমাদের রাষ্ট্রীয়, সমাজ ও ধর্ম জীবন একটা স্ননির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও শক্তিশালী ভিত্তি লইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় পরিচালকমন্ডলী, টোল, শিক্ষক, অভিভাবক, মঠধারী ও সাধু সন্ন্যাসী সকলকে ধর্মশিক্ষা দ্বারা সমাজকে শক্তিশালী সংস্কারে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সমাজধর্ম ও কর্মব্যবস্থাই কর্মধর্ম। এই অধ্যায়ে সমাজ ধর্মের কি ভাবে প্রবর্তন হইয়াছিল, আজ কাল ইহার রূপ কিরূপ হইয়াছে, ইহার সংশোধন ইত্যাদি বিষয়

আলোচনা করা হইয়াছে। আবশ্যিক বিরোধিতা নিরসনের জন্য সব স্থানেই বেদ হইতে বেশীর ভাগ প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পাঠক দেখিতে পাইবেন হিন্দুদের সমাজধর্ম অত্যন্ত শক্তিশালী। উহা ভুলিয়াই আমরা পদানত হইয়া গিয়াছি।

উপাসনা ধর্ম অংশে নিগুণ ব্রহ্মোপাসনা ও উহার শাখা প্রশাখায় আরও সব প্রকারের উপাসনাবিজ্ঞান আলোচনা করা হইয়াছে। এই সব শাখা প্রশাখা কিরূপে বিদ্যমান উহাও দেখানো হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মোপাসনা, অবতার, দেবতা, পিতৃ, মহাপুরুষ, প্রেত উপাসনাগুলি কিভাবে একই ব্রহ্মোপাসনার শাখা সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। নারায়ণ শিলা, শিব মূর্তি, কৃপাণ, শীতলা, হনুমান প্রভৃতি মূর্তির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট করা হইয়াছে। বহু শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা ও বৈজ্ঞানিক চিত্র দ্বারা শিব মূর্তি সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন করা হইয়াছে। নিত্য উপাসনা স্তোত্র, কয়েকটি সগুণ ব্রহ্মস্তুতি, অভয় সূক্ত, বেদের মহামন্ত্র, উপনিষদের জ্ঞান অংশের উদ্ধৃত মন্ত্রগুলি সকলেরই আয়ত্ত করা কর্তব্য। মহাপুরুষ উপাসনা অংশে বহু পূজনীয়া নারীর জীবন চরিত্র এমনভাবে আলোচিত করা হইয়াছে যে উহা দ্বারা প্রত্যেক চরিত্রের উপর এক একপ্রকার মহান প্রেরণা প্রতিষ্ঠা করিবে। এই অধ্যায়ে জীবন চরিত্রের মধ্য দিয়া সমাজ ও জাতি গঠনের প্রেরণা এবং ব্রহ্মজ্ঞান রহস্য উদ্ঘাটন করা হইয়াছে। ইহা ছোট ছোট বালক বালিকাদের চরিত্র গঠনে বিশেষ সাহায্য করিবে। জ্ঞানধর্ম অংশে উপনিষদের জ্ঞান, দার্শনিক জ্ঞান, যোগ নির্দিষ্ট গ্রন্থিভেদ জ্ঞান, সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান, বিশেষভাবে সমন্বয় করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। হিন্দুধর্ম কিরূপ যুক্তিবাদিতার ধর্ম এই অধ্যায়ে এবং সমস্ত গ্রন্থেই উহার দিক দর্শনের ত্রুটি করা হয় নাই। হিন্দুধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের দার্শনিকতায় কি ভেদ উহা এই পুস্তকের অনেক স্থানে দেখান হইয়াছে। জ্ঞানধর্ম অধ্যায়ে সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের একটা সাধারণ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, যাহা বালক, বৃদ্ধ এবং প্রত্যেক হিন্দু নর নারীর জানা প্রয়োজন।

গ্রন্থের শেষে “স্বাস্থ্য ধর্ম” নামক একটি সুন্দর অধ্যায় দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সমবেত ব্যায়াম করিবার জন্য সংস্কৃত শব্দসম্বলিত কুচ্কাওয়াজ সন্নিবেশ করা হইয়াছে। সহজসাধ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনেকগুলি ব্যায়াম ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। যাহা নরনারী মাত্রই চিরজীবন অনুষ্ঠান করিয়া স্ফুট থাকিতে পারিবেন। গ্রন্থের শেষ ভাগে সামবেদীয় সঙ্কেতোপাসনা দিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আবশ্যিক টীকা টীপনী ও সহজে শান্তিপ্ৰদ যোগ বিধানগুলি আলোচনা না করিলে এই অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য কমিয়া যায় এবং গ্রন্থের আকারের বৃদ্ধি অশোভন মনে করিয়া আমরা সেই ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছি।

গ্রন্থে পৌরোহিত্যবাদ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের কথা আসিয়াছে। সেই সব কথা স্পষ্ট করা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র (মজুর) কর্মের ভাগ অনুসারে শাস্ত্রে চার বর্ণের কথা আছে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতেই চার বর্ণের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বঙ্গদেশ। এখানে চার বর্ণ নাই। যাহা হউক ব্রাহ্মণগণ আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পৌরোহিত্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা। ক্ষত্রিয়গণ শক্তিবাদ (পুরুষোত্তম বাদ) ও আঙ্গরিকবাদ স্থাপন করেন। বৈশ্য হইতে সমাজপালন ও শোষণবাদ (রাক্ষসবাদ) আসিয়াছে। শূদ্র হইতে কর্তৃত্বহীন কর্মবাদ ও তামসিকতা

আসিয়াছে। সকলে সমান ও সকলের মধ্যে একই আত্মা বিদ্যমান ইহা ব্রহ্মণ্যবাদ। ব্রাহ্মণগণ সমাজের অংশ বিশেষ ও তাহাদের বংশ শ্রেষ্ঠ এবং তাহারা ভিন্ন সমাজের অন্যান্য অংশ ও তাহাদের বংশ নিকৃষ্ট; দেবালয়ে, তীর্থে, মন্ড্রে, শাস্ত্রে ইহারাই ঈশ্বরের ঠিকাদার এবং অন্যান্য অংশ চাকর বাকর এইরূপ মতবাদই পৌরোহিত্যবাদ। ব্রহ্মণ্যবাদকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার পক্ষে রাক্ষস এবং অসুরেরা অত্যন্ত বিপজ্জনক শত্রু। ইহাদিগকে দমিত রাখিয়া সমাজের সমস্ত অঙ্গের বিকাশনীতি প্রতিষ্ঠিত রাখিবার কর্মনীতিই শক্তিবাদ ও পুরুষোত্তম বাদ। পৌরোহিত্যবাদ, আঙ্গুরিকবাদ, শোষণবাদ ও তামসিকতাকে বহিষ্কার করিতে হইবে, ইহাই পুরুষোত্তম বাদ। পৌরোহিত্যবাদ যে দেশে যত বৃদ্ধি হইবে সেই দেশে দিনের পর দিন শূদ্রের সংখ্যা ও তামসিকতা বৃদ্ধি হইবে। তামসিকগণকে হাজার জুতা মার অপমান কর, না হুস্ না হাওয়াস। নিজেরা নিত্য উপাসনা করিবে। মঠে, মন্দিরে, দেবালয়ে নিজেরা ব্রহ্মস্তুতি পাঠ করিয়া জল, ফুল, দীপাদি ও প্রণাম নিবেদন করিবে। ফলে পৌরোহিত্যবাদ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

একদল মূর্খ সর্বত্র গজাইয়াছে যাহারা হিন্দুধর্মকে অহিন্দু ধর্মের মত বিশ্বাসবাদ বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়। তাহাদিগকে আমরা এই পুস্তক পাঠ করিতে বলি। যাহারা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, চিরজীবনই ধর্ম্যানুষ্ঠানকে জীবনের পবিত্রতম ব্রত বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরেন, বলাবাহুল্য এই পৃথিবীতে ইহারাই লাভবান। ধর্ম্যানুষ্ঠান সিদ্ধ হইলে উহা দ্বারা শক্তি, স্বথ ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়। উহা যদি সিদ্ধ না হয়, তবে এই শরীরে আংশিক স্বথ, আংশিক শান্তি ও আংশিক জ্ঞান ও পরকালে স্বথ হয় এবং জন্মান্তরে এই পৃথিবীতে ধনী, স্বথী ও কর্তৃত্বসম্পন্ন হইবার ভাগ্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান মানুষকে কেবলই আত্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করে না, ইহা মানুষকে লৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিতেও বিশেষভাবে সাহায্য করে। বৈজ্ঞানিক ধর্মাচরণের অভাবে বা মূর্খ ও বর্বর ধর্মের অনুশীলনের ফলে মানুষ অন্ধহীন, ঐশ্বর্য্য হীন, প্রতিষ্ঠা হীন, যশ হীন ও ভাগ্য হীন হইয়া জন্ম লয়। এই সম্বন্ধে বেদ ও গীতার আদেশ দেখুন।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষ্টিভ্যা শাস্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৬-৪১

যাঁহারা যোগভ্রষ্ট হন তাঁহারা পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন, এবং সেইখানে বহু বহু যুগ স্বথে অতিবাহিত করেন, তাঁহারা শুদ্ধ বংশে এবং ঐশ্বর্য্যযুক্ত গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন ॥

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ ।

ততঃ স্বর্গেষু লোকেষু শরীরাত্বায় কল্পতে ॥ কঠ ১১৩

এই দেহেই যদি কেহ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন এবং জানেন, শরীরপাতের পূর্বেই সেই লোক সকল সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। আর যিনি বুঝিতে অশক্ত হন তিনি উহার ফলে স্বর্গাদি স্বথস্থান লাভের অধিকারী হন ॥

ইতি-

গ্রন্থকার

## সূচীপত্র

বিষয়	অনুচ্ছেদ - পত্রাঙ্ক	বিষয়	অনুচ্ছেদ - পত্রাঙ্ক
ধর্ম কাহাকে বলে		জ্ঞান লাভের জন্য বহু দীক্ষা	
সমাজ জীবনের পূর্ণতাই ধর্ম		হিন্দুদের ভাববাদিতা ও ভণ্ডামী	
অহিন্দু ধর্ম ও বিশ্বাসবাদ		বেদে স্বরাজের শক্ত আদেশ	
হিন্দুধর্মের শাখা		উপাসনা (নিত্য ও নৈমিত্তিক)	
হিন্দুধর্ম কৰ্ম, উপাসনা, জ্ঞান		নির্গুণ ব্রহ্মলক্ষ্যে ৭ প্রকার উপাসনা	
কৰ্ম ধর্ম		উপাসনায় শরীর ও মনের পুষ্টি	
সমাজকে শক্ত রাখাই কৰ্ম ধর্ম		ত্রিসঙ্কেতপাসনা ও পাঁচ সঙ্কেত	
বর্ণ বিদ্বেষই শক্তিহীনতা		সংক্ষেপ সঙ্কেতের ক্রম; প্রাণায়াম	
হিন্দুধর্ম যুক্তিবাদমূলক		মহাব্যাহতি ও ব্যাখ্যা	
দর্শন ও যুক্তিবাদের উৎকর্ষ		গায়ত্রী ও ব্যাখ্যা	
বিশ্বাসবাদ		ব্রহ্মসত্ত্ব ও ব্যাখ্যা	
বেদ জ্ঞান ও ঋষি		অতি সংক্ষেপে সঙ্কেতপাসনা	
দার্শনিকতা ও যোগানুষ্ঠান		মহাব্যাহতির কথা	
মনু, বর্ণভেদ ও পৌরোহিত্যবাদ		মহাব্যাহতি, বেদ, গীতা ও কৃষ্ণ	
ইংরেজ, সাম্প্রদায়িক ঘৃষ ও		ব্রহ্মনাড়ী চিত্র	
পৌরোহিত্যবাদে সমাজের ক্ষতি		উপনয়নে অজ্ঞানমূলক শিক্ষা অন্যায়	
পৌরোহিত্যবাদিতা ও ভাববাদিতার ফল		আস্পরিকতা, বর্করতা ও পৌরোহিত্য	
বেদে সর্ববর্ণে প্রেমের আদেশ		নীতি	
ভাববাদীরা বেদের আদেশ অমান্যকারী		সগুণব্রহ্ম, গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও	
বীরত্ব, নির্ভীকতা ও বৈদিক ধর্ম		শক্তি। মনোবিকাশের স্তর	
বেদে চারি বর্ণে সমব্যবহার আদেশ		সঙ্কেতপাসনা ও সগুণ ব্রহ্মোপাসনার	
গীতায় ও বেদে কৰ্ম, উপাসনা জ্ঞান		লক্ষ্য একই	
সম্বন্ধে একই নীতি		মস্তিষ্ককেন্দ্র চিত্র	
কৰ্মভেদ, চারবর্ণ প্রাকৃতিক নিয়ম		সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভূতির দৃষ্টান্ত	
শূদ্র শব্দের অপব্যবহার ও গালি		মূর্ত্তিবিজ্ঞান, নারায়ণ শিলা	
অস্বরের সঙ্গে ব্যবহার		মূর্ত্তিগুলি ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার সঙ্কেত	
গুরুজনে ও আত্মীয়ে কর্তব্য		সরস্বতীপূজা ও ছাত্রদের কর্তব্য	
শিষ্টাচার ও নিত্যনিয়ম ধর্ম		পুরোহিতের ফাঁকি পূজা	
ওঁ নমস্তে ওঁ নমস্কার		নারায়ণ শিলায় সমাজ প্রেম	
চার আশ্রম		দুর্বল ও দাস্তিক নেতা ও রাজা	
দশবিধ বৈদিক সংস্কার			

নারায়ণ শিলা ও ছুঁৎ মার্গ  
 শিব মূর্তি; মস্তিষ্ক মনস্তত্ত্ব, ষট্চক্র  
 মর্ম্মকেন্দ্র, শিব ও শরীরস্থিত আত্মজগৎ  
 মস্তিষ্কে শিবপিণ্ড, মন, বুদ্ধি কেন্দ্র, ক্ষুদ্র  
 মস্তিষ্ক ও প্রাণ মস্তিষ্ক  
 আজ্ঞাচক্র, দ্বিদল, শিবপিণ্ড, মস্তিষ্ক।  
 শিবপিণ্ডধ্যানে নীরোগ শরীর  
 বৃহৎ মস্তিষ্ক, আজ্ঞা, সহস্রার, শিবমূর্তির  
 সর্পফণা, ব্রহ্মনাড়ী  
 শিবের পীনেট ও আজ্ঞাচক্র  
 শিবের পীনেট ও উত্তর দিক  
 শিবমূর্তি, মিথ্যা প্রচার, 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্র  
 ও আত্ম উপাসনা  
 শিবমূর্তি, আজ্ঞা, বীজ, অক্ষুরচিত্র  
 মস্তিষ্কে আজ্ঞা সহস্রার ও শিবপিণ্ড চিত্র  
 আজ্ঞা, সহস্রার, শিবপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক  
 সম্বন্ধ চিত্র  
 লিঙ্গমূর্তি ও শাস্ত্রের প্রমাণ  
 লিঙ্গমূর্তি, খৃষ্টান মন্দির এবং কাবার  
 মন্দির; হিন্দু ও অহিন্দু ধর্মে দার্শনিকতা  
 কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানধর্ম্ম; তিন  
 ব্যাপারেই খৃষ্টবাদী ও মুসলমানগণ  
 বৈদিক ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে  
 মূর্খ পাদরীদের মূর্তিখণ্ডন ও উহার  
 যথাযোগ্য জবাব  
 সগুণ ব্রহ্মস্তুতিসম্বন্ধীয় শ্লোক  
 অবতার উপাসনা  
 অবতার ও ভ্রান্ত ধারণা  
 ১ হইতে ১৬ কলার জীবভেদ ও চরিত্র  
 ভেদ  
 অবতার কলা; রাম, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, লেনিনে  
 কর্ম্ম বিকাশের ভেদ। ভাববাদীদিগকে  
 অবতার বলা অন্যায  
 শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীরাম  
 শ্রীবুদ্ধ  
 বুদ্ধগয়ার মন্দির ও হিন্দুদের উপর  
 নেতাদের অবিচার  
 রাম, বুদ্ধ ও কৃষ্ণ এবং হিন্দুসমাজে  
 ইহাদের প্রভাব  
 ব্রহ্মনাড়ী ও অবতার  
 মহাপুরুষের উপাসনা  
 স্বয়ম্ভুব মনু, ডেমোক্রেসী, কম্যুনিজম,  
 আঙ্গরিক সমাজ ও উহাদের অগ্নায়ু  
 সপ্ত ঋষি, আদি পিতা  
 চার বর্ণ ও ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন  
 অনুন্নতরা কে?  
 ব্যাসদেব। জৈমিনী। গৌতম। কণাদ।  
 কপিল। পতঞ্জলী। পাণিনি। যাজ্ঞবল্ক্য।  
 সিদ্ধ নাগার্জুন। হরিশ্চন্দ্র।  
 ধর্ম্মের কীর্ত্তি ও বর্বর কীর্ত্তি  
 মহাবীর হনুমান, সাগর ডিঙ্কানো  
 মহারাজ শিব, রাজার অবিচারে প্রজার  
 অবশ্য পতন  
 মহারাজ যযাতি  
 ভীষ্ম। কর্ণ। অনুন্নত হিন্দু। অর্জুন।  
 পাশুপৎ, এটম্ বম্ব, গুরুগোবিন্দ।  
 অনুন্নত হিন্দু। প্রতাপ সিংহ। শিবাজী।  
 স্বামী দয়ানন্দ  
 স্বামী বিবেকানন্দ  
 সতী (দ্রৌপদ, রাজস্থান নারী)  
 ব্রহ্মজ্ঞান রহস্য ও বেদের কথা  
 গার্গী রাধিকা  
 শবরী  
 দেবতা উপাসনা (আঙ্গরিকতা ও দৈবী  
 সম্পদ)  
 অভয় সূক্ত  
 অহিংসা ও প্রেম  
 শান্তি। তেজ

বিষয় অনুচ্ছেদ - পত্রাঙ্ক

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ  
সূর্য্য, চন্দ্র, গঙ্গা, যমুনা, হিমালয় ও  
দেবতা  
নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম দেবতা  
লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক  
ওঁ, ব্রহ্মনাড়ী, দেবতা উপাসনা  
পিতৃ উপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা  
ব্রহ্মজ্ঞান লক্ষ্যে সব উপাসনা প্রয়োজনীয়  
শাখা ও প্রশাখা মাত্র  
আল্লাহ ও গড্ উপাসনার সঙ্গে আর্য্য  
উপাস্যের কোন মিল নাই  
শরীর শুদ্ধি ও পিতৃ উপাসনা  
ভাবশুদ্ধি ও দেব উপাসনা  
নীতিশুদ্ধি ও সগুণ ব্রহ্মোপাসনা  
আত্মশুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান  
প্রেত উপাসনা, সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে  
বিভিন্ন স্তরের আত্মারা  
মূর্ত্তি দর্শন ও প্রেতজগৎ  
শীতলা পূজা রহস্য  
অস্ত্র প্রতীক কৃপাণ (বলিদান ও কৃপাণ  
পূজা)  
অগ্নি, জল ও ব্রহ্মনাড়ী  
জ্ঞান ধর্ম্ম (জ্ঞান কি)  
জ্ঞান = অনুভূতি, যুক্তি, বেদ  
গ্রন্থি ভেদ জ্ঞানই আসল জ্ঞান  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র গ্রন্থি  
মর্ম্ম রহস্য ও মর্ম্মভেদ জ্ঞান

বিষয় অনুচ্ছেদ - পত্রাঙ্ক

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান  
দার্শনিক জ্ঞান। (ষট্ দর্শন)  
সাংখ্য, পাতঞ্জল ও ব্রহ্মসূত্রের মোটামুটী  
জ্ঞান  
মহামন্ত্র জ্ঞান  
সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান  
নির্গুণ ব্রহ্ম, বিজ্ঞান স্তর  
সৃষ্টির দৈবস্তর  
সৃষ্টির স্থূল স্তর  
উপনিষদের জ্ঞান  
ধর্ম্ম গ্রন্থ  
বেদ, চতুর্বেদ, ত্রয়ী, শ্রুতি  
স্মৃতি ও বেদ  
সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ  
ষড়ঙ্গবেদ। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ,  
ব্যাকরণ, জ্যোতিষ।  
উপবেদ।  
স্মৃতি পুরাণ, মহাভারত, তন্ত্র শাস্ত্র  
যোগশাস্ত্র  
রুদ্রী, গীতা, চণ্ডী  
স্বাস্থ্য ধর্ম্ম। হিন্দুদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান,  
অন্যান্যদের সঙ্গে তুলনা  
ব্যায়ামের নিয়মানুবর্ত্তিতা কুচ্কাওয়াজ  
ব্যায়াম বিধি  
বিস্তারিত সঙ্কেতোপাসনার কথা

ॐ षट् श्रीमद गुरवे नमः ।

## धर्म काहाके बले

तोमरा नदी देखियाछ। समुद्रेर दिके प्रवाहित हईया शेषकाले समुद्रे याईया मिलियाछे। समुद्रे याईया मिलित हओया नदीर धर्म। एईरूप मानुष क्रमशः विकाशेर दिके अग्रसर हईया पूर्णता वा ब्रह्मत्व प्राप्तु हय। पूर्णता लाभई मानवेर धर्म। तोमरा जान, समुद्रेर जल बाण हईया पाहाडे ओ देशेर सर्वत्र गमन करे एवंग बर्यारूपे सेई जल पृथिवीते पतित हईया परे नदीरूपे समुद्रे याय। ठिक एईरूप जीवेर उंपत्तिओ ब्रह्म हईते हईया থাকे। जीव ओ जगतेर उंपत्ति ओ लयेर एई नियमके धर्म जानिबे। एई नियमके जानिते ना पारिले आमामे शान्ति ओ तृप्ति हय ना। एई नियमके जानिवार जन्य पृथिवीते ये धर्मेर उंपत्ति हईयाछे ताहार नाम हिन्दुधर्म। एई नियमके जानिवार जन्य कत शत योगी ऋषि ओ महात्मा आमामे एई हिन्दु समाजे जन्मग्रहण करिया ब्रह्मचर्य, त्याग ओ तपस्यामय जीवन काटाईया दियाछेन। एखनओ हिन्दुदेर मध्ये धर्मेर एई निगूट तत्व जानिवार जन्य योगी ओ तपस्वीर अभाव नाई। हिन्दु भिन्न अन् कोन धर्मै एई निगूट तत्व जानिवार कोनई विधान आविष्कार हय नाई।

मानुषेर समाज-धर्म, राष्ट्र-धर्म, शिक्षा ओ साधना सबई पूर्णतार पथ खूजितेछे। मानुषेर समस्त प्रकार नियमई पूर्णतार पथ चाय; मानुषेर ईहाई धर्म। यतक्षण पूर्णता प्राप्तु हय ना ततक्षण उहार द्वारा आमामे प्रकृत शान्ति ओ तृप्ति हय ना। काजेई तोमरा धर्म शिक्षार मध्ये पूर्णतार नियम खूजिते चेष्टा करिबे।

आजकाल अनेक अहिन्दु धर्मेरओ नाम शुना याय। एँ सब धर्म विश्वासवाद मात्र। एँसबे कोन दार्शनिकता वा युक्ति नाई। आमामे देशेओ आधुनिक काले विना प्रयोजने अनेक उपधर्म वा शाखाधर्म प्रवर्तित हईयाछे। मानुष एँ धर्म सामयिक विश्वास करे; किन्तु दार्शनिकता ओ युक्तिवाद लईया विचार करिले देखा याईबे एकटा दिनओ मानुष एँ सब धर्म प्रतिपालन करिते पारे ना वा प्रतिपालन करिले कोन प्रकारेई जीवन चले ना। आधुनिक युगे कतगुलि उपधर्म पृथिवीते प्रवर्तित हईवार दरुण आमामे धर्म एखन हिन्दुधर्म नामे ख्याति लाभ करियाछे। तोमरा धर्म शान्ति पाठ करिले देखिते पाईबे कोथाओ हिन्दुधर्म नामे कोन धर्म नाई। धर्मशास्त्रे समाजधर्म, राष्ट्रधर्म, राजधर्म, प्रजाधर्म, सन्यासधर्म, गृहस्थधर्म, पतिधर्म, नारीधर्म इत्यादि धर्मेर नाम पाओया याईबे। आमामे धर्म अर्थे समाज जीवनेर ओ अध्यात्म जीवनेर सर्वप्रकार उच्च नीति जड़ित शक्तिशाली जीवनके बूवाईया থাকे।

हिन्दुस्थाने यत प्रकार धर्ममत उखित हईया देशे विदेशे प्रचारित हईयाछे सबई हिन्दुधर्म। नवीन, प्राचीन, वैदिक, तान्त्रिक, पौराणिक, प्राकृतिक, बौद्ध, शिख, जैन सर्वप्रकार शाखाकेई हिन्दुधर्म बलिया तोमरा जानिबे। तोमरा एँ सब विभिन्न प्रकार

হিন্দু ধর্মের শাখা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে বেদ নির্দিষ্ট “ওঁ”এর উপাসনা সব শাখাতেই বিদ্যমান।

হিন্দু ধর্মের তিনটা দিক আছে - (১) কর্ম, (২) উপাসনা, (৩) জ্ঞান। বেদকে আশ্রয় করিয়া কর্মধর্ম, উপাসনাধর্ম ও জ্ঞান ধর্মের ভিত্তি স্প্রতিষ্ঠিত জানিবে। বেদের ভিত্তিহীন আধুনিক উপধর্মের মধ্যে কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান ধর্মের সামঞ্জস্য নাই।

## কর্ম-ধর্ম

সমাজ রক্ষায় আমাদের যে স্বাভাবিক কর্তব্য, উহাই কর্ম-ধর্ম। যদি আমরা কর্ম-ধর্ম ঠিকমত পালন করিতে না পারি তবে আমাদের সমাজজীবন ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদি সমাজজীবন নষ্ট হইয়া যায় তবে অধ্যাত্ম জীবন বা ধর্মজীবন অসম্ভব। যে দিন হইতে হিন্দুরা পরাধীন হইয়াছে সেইদিন হইতেই হিন্দুদের সমাজজীবন মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে।

কর্মধর্মের বিশৃঙ্খলতাই আমাদের পতন ও পরাধীন করিয়া দিয়াছে। কর্ম-ধর্ম, উপাসনা ধর্ম ও জ্ঞান ধর্ম একই অধ্যাত্ম বা আত্ম ধর্মের তিনটা বিভিন্ন দিক। এই তিন প্রকার ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য লৌকিক জীবনের স্বখ ও সমৃদ্ধি এবং মনোজগতের শান্তি। তিনটি ধর্ম এমন ভাবে জড়িত যে একটিকে ত্যাগ করিয়া অন্যটিকে স্মন্দর করা যায় না।

আমাদের সমাজজীবনের ভুল ভ্রান্তির জন্য আমরা দুর্বল ও পরাধীন হইয়া গিয়াছি। আমাদের সমাজজীবনের সমস্যা এখন নূতন ভাবেই সমাধা করিতে হইবে। আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা ও প্রাচীনতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আমাদের এই জীবন আবার গড়িয়া লইতে হইবে। সমাজজীবনকে শক্তিশালী করা এবং শক্তিশালী রাখা এবং সমাজ জীবনকে স্বখময় করা এবং স্বখময় রাখাই আসল সমাজধর্ম। সমাজজীবনকে এইভাবে শক্তিশালী রাখিবার জন্যই সমাজ জীবনের সকলের সহিত সকলের ব্যবহার এবং কর্তব্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। আমরা যদি সমাজজীবনের আসল লক্ষ্য ভুলিয়া যাই তবে অন্যান্য কর্তব্যকর্তব্যও উদ্দেশ্যহীন বা লক্ষ্যহীন হইয়া যাইবে। সমাজ ধর্মের ভিত্তি প্রেম। সমাজ জীবনের পতনের মূলে ঘৃণা ও বিদ্বেষই আমাদের কর্ম ধর্মের ভিত্তি হইয়াছিল। কাজেই কর্মধর্মের যে ইহা পতন ইহা মনে রাখিবে।

ব্রাহ্মণ ভাবিল, আমরা শ্রেষ্ঠ; এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রগণ নিকৃষ্ট। এইরূপ ক্ষত্রিয় ভাবিল, আমরা শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রগণ নিকৃষ্ট। বৈশ্য ভাবিল আমরা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্রগণ নিকৃষ্ট। শূদ্র ভাবিল আমরা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ নিকৃষ্ট। একজন যদি অন্যজনকে বিনা কারণে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে তবে স্বভাবতঃই অন্য জন তাহাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবেই। তোমরা কিছুদিন বেশ অনুসন্ধিৎসা লইয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিচরণ করিলে দেখিতে পাইবে বিনা কারণে প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যেক শ্রেণীর একটা জন্মগত বিদ্বেষভাব বিদ্যমান। এদিকে প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই কোলিন্য প্রথা প্রবর্তিত হইবার পর একই শ্রেণীর বিভিন্ন শাখাতে

বিদ্বেষ এমন জঘন্য ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে যে উহা দেখিলে তোমরা হতাশ হইবে। একটা জাত বিগত ১৫০০ বৎসর যাবৎ ঘৃণিত বিদ্বেষ বাদের অনুশীলন করিবার পর সেই জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে না কি? একে ত সমবেতভাবে বৈদিক ধর্ম অনুশীলনের পথ রুদ্ধ, তাহার উপর প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রত্যেক শাখা প্রশাখা বিদ্বেষবাদে জর্জরিত; বল এরূপ সমাজ পদানত হইবে না তো কাহারা পদানত হইবে?

হিন্দুদের ধর্মবিধানের মূলে অন্যান্য ধর্মের মত বিশ্বাসবাদের\* স্থান নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদ ও দার্শনিকতা ও বিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া অবস্থিত; যদি তোমরা দার্শনিকতা ও যুক্তিকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পার এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পার তবে হিন্দু ধর্মও বুঝিতে পারিবে।

তবে তোমরা একটা কথা এখানে মনে রাখিবে; যুক্তিবাদ ও দার্শনিকতা বলিতে তুমি কতটুকু যুক্তি ও দার্শনিকতাকে বুঝিতে পার সেইটুকুই সব নহে। এই যুক্তিবাদ ও দার্শনিকতাকে সমুদ্র শিখরে স্থান দিবার জন্য আমাদের দেশে অনেকগুলি দর্শন শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। যথা- বেদান্ত, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, বৈশেষিক, ন্যায়, বৌদ্ধ দর্শন ইত্যাদি। তোমরা যখন একখানা শাস্ত্র পাঠ করিবে তখন মনে হইবে ইহা নিশ্চয়ই অকাট্য। কিন্তু আশ্চর্য্য, অন্য দর্শনখানা পাঠকালে দেখিতে পাইবে, যাহা অকাট্য তাহাও কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলেই নিজ নিজ প্রমাণ বেদ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। একমাত্র বৌদ্ধদর্শন বেদের প্রমাণ সংগ্রহ করে নাই। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের অনুকূলে বেদ মন্ত্রের মোটেই অভাব নাই। কারণ বৌদ্ধদর্শনের ভিত্তি সাংখ্যদর্শন এবং উহার লক্ষ্য অদ্বৈতবাদ।

বেদে লৌকিক অলৌকিক সর্বপ্রকার চিন্তা বা জ্ঞানের সংগ্রহ আছে। ইহা কোন এক ব্যক্তিকৃত জ্ঞান নহে। ইহাতে বহু ঋষি দৃষ্ট মন্ত্র রাশির সংগ্রহ আছে। জ্ঞানের অনেক স্তর আছে। একজন ঋষি যখন যেমন স্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তখন সেই স্তরের মন্ত্র বা জ্ঞানগুলি মাত্র দেখিতে বা অনুভব করিতে পারেন। জ্ঞানের স্তর ভেদের জন্যই আমাদের দেশে অনেকগুলি দর্শনশাস্ত্র হইয়াছে।

এত দর্শন শাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও সাধনা ও যোগবিদ্যা-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কেহই মতভেদ দেখান নাই। কাজেই তোমরা যোগ অনুশীলন ব্যাপারে ও উপদেশ ব্যাপারে দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বিভ্রান্ত হইবে না।

তোমরা মনু স্মৃতির নাম শুনিয়াছ। স্মৃতিশাস্ত্র বলিতে সমাজ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। এই সমাজ ব্যবস্থারও অনেক শাস্ত্র রহিয়াছে। সকলেই বেদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ

---

\* বিশ্বাসবাদ। যে বস্তুর দার্শনিকতা বা যুক্তি নাই; ভ্রান্তি বশে অথবা গুণামি করিবার জন্য একটা প্রয়োজনীয় কিছু মানিয়া লওয়ার নাম বিশ্বাসবাদ। আমাদের দেশের সর্বধর্মসমন্বয়বাদও যুক্তিহীন এবং কাল্পনিক বিশ্বাসবাদ মাত্র। আর্য্যজ্ঞানের ঈশ্বরতত্ত্ব এবং গড্ বা অল্লাহ্ একতত্ত্ব নহে। ঈশ্বর ব্যাপক; কিন্তু গড্ বা অল্লাহ্ ব্যক্তি বিশেষ মাত্র।

মানিয়াছেন। আজকাল অনেকে বর্ণ ভেদ প্রথা সমর্থন করেন না। সমর্থন না করিবার কারণও আছে। আমরা বর্ণভেদ সমর্থন করি। কিন্তু অছূতবাদ মানিনা। অছূতবাদ আমাদের ধর্মের সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ বস্তু। আমরা জাতিভেদ মানিলেও উপাসনাভেদ সমর্থন করি না। কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক উদার ব্রাহ্মণ্যবাদরূপ স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া সমাজে বিদ্রোহবাদ বা পৌরোহিত্যবাদ স্থাপন করিয়াছে। কিছু লোক নিজেদের স্বার্থ বুঝিয়া ইহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে এবং আরও কুৎসিৎ হীন মনোবৃত্তি ইহাতে প্রক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে। যাহারা এই নীচতা মানিয়া লইয়াছে, তাহারা বিশ্বাস বশে এবং অজ্ঞানতা বশে দুর্বল ছিল বলিয়াই মানিয়াছে। যাহারা ইহা প্রবর্তন করিয়াছে তাহারা যে খুবই দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা মানিয়া লইয়াছে তাহারা ছিল দুর্বল এবং যাহারা ইহা আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে তাহারা স্বার্থপর।

আমাদের দেশে যখন ইংরাজরা দুষ্টতা বশতঃ মুসলমানগণকে ঘুষ দিয়া সাম্প্রদায়িক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তখনও ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটে। স্বার্থবশে একদল মুসলমান উহা আঁকড়াইয়া ধরে এবং আরও ঘুষ পাইবার চেষ্টা করিতে থাকে। দুর্বলতায় জড়িত হইবার দরুণ জাতীয়তাবাদীরা ইহা মানিয়া লয়। দুষ্টতা, স্বার্থ ও দুর্বলতা এইভাবেই একটা জাতকে সর্বনাশের পথে লইয়া যায়। ইংরাজের দুষ্টতা, একদল মুসলমানের স্বার্থপরতা ও জাতীয়তাবাদীদের দুর্বলতার সহিত আমাদের দেশের পৌরোহিত্যবাদের সমভাবে তুলনা করা যায়।

আমাদের দেশে উপাসনায় ভেদবাদ স্থাপনার ব্যাপারে অনেক ভাববাদী মহাত্মাও যথেষ্ট ভুল করিয়াছেন। পৌরোহিত্যবাদীরা ইহাদের আড়ালে থাকিয়া নানা প্রকারেই চাল খেলিয়াছেন। ইহা যথেষ্টই অন্যায্য হইয়াছে। উপাসনায় ভেদবাদ আনিবার দরুণ জাতিভেদ প্রথা আমাদের নিকট তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। যদি আমরা একটু চেষ্টা করিয়া উপাসনায় ভেদবাদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারি তবে জাতিভেদ প্রথার কথা আমাদের মনেও থাকিবে না। এক যুগের কর্মভেদই এই যুগের জাতিভেদ। দার্শনিক দৃষ্টিতে ইহার কোনই অস্তিত্ব নাই। তোমরা সকলেই বৈদিক উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিবে তাহা হইলে পৌরোহিত্যবাদ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

বেদে কর্মভেদে জাতিভেদের কথা আছে; কিন্তু বিদ্রোহের স্থান কোথাও নাই। বরং প্রেমই বেদের প্রধান ভিত্তি যথা - ওঁ রুচং নো ধেহি ব্রাহ্মণেশু রুচং রাজেশু ন স্কৃধি । রুচং বিশেষু শূদ্রেষু ময়ি, ময়ি ধেহি রুচা রুচম্ ॥ (হে পরমাত্মন) আমাদের অত্যন্ত প্রীতি ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রতি স্থাপনা কর। আমাদের অত্যন্ত প্রীতি যোদ্ধাগণের প্রতি স্থাপনা কর। আমাদের অত্যন্ত প্রীতি হইতেও প্রীতি ব্যাপারী ও মজুরদের প্রতি স্থাপনা কর ॥ (যজুর্বেদ অঃ-১৮; মন্ত্র ৪৮ ॥)

উপাসনার জন্যও বিভিন্ন জাতির জন্য বা বিভিন্ন প্রকারের কর্মী সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিধি বেদ বলেন নাই। যথা -

ওঁ যথমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ ।

ব্রহ্ম রাজেন্যাভ্যাং শূদ্রায় চর্য্যায় স্বায় চারণায় ।

প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং ।

মে কামঃ সমৃধ্যতামুপমাদো নমতু ॥ এইরূপ -

আমি (ঈশ্বর) এই বেদবাণী সকল, যাহা অত্যন্ত কল্যাণময়ী, সমস্ত মানুষের জন্য বলিয়াছি (তোমরাও সেইরূপ বল)। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জন্য, শূদ্রদের জন্য, বৈশ্যের জন্য, নিজের স্ত্রী ও চাকরাদির জন্য এবং অতি শূদ্রের জন্য, আমার এই কামনা বৃদ্ধি হউক যে - মূর্খগণকে উপদেশ দেওয়া হউক। যে ইহা (এই জ্ঞান) দান করিবে আমি তাহার প্রিয় হইব। এবং তাহাদের উভয়ের (দাতা ও গ্রহীতা) সমৃদ্ধি ও আত্মকল্যাণ প্রাপ্তি হইবে। (প্রিয়ো দেবানাং = মূর্খ। এ সম্বন্ধে পাণিনির সূত্র আছে।) যজু অঃ ২৬। মন্ত্র ২॥

তোমরা বেদের এই মহান আদেশ অনুসরণ করিয়া নিজেরা বৈদিক ধর্মালুশীলন করিবে এবং অন্যকেও করাইবে। যে সব মহাত্মাগণ বেদের মহান আদেশ ত্যাগ করিয়া আমাদের তঁাহাদের নিজেদের মনের মত ভাববাদ শিক্ষা দিয়াছেন তঁাহারা নিজেরা বেদের আদেশ অমান্য করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। বেদের মধ্যে সমাজ-ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী উপদেশই বিদ্যমান। যদি তোমরা সংহিতাভাগ (বেদ) পাঠ কর তবে দেখিতে পাইবে বীরত্ব, নির্ভীকত্বকে কত জোর প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে ও আঙ্গুরিক আক্রমণকে ভাঙ্গিয়া দিবার কিরূপ যুক্তি সঙ্গত আদেশে মন্ত্রগুলি ভরপুর।

যেখানেই চারি জাতির মধ্যে ব্যবহারের কোন কথা আসিয়াছে সেইখানেই দেখা যায় বেদ কেবলই সমৃদ্ধির উপর জোর দিতেছেন। কোথাও অসমৃদ্ধির কথা নাই। যথা-

ওঁ তাং মে সহস্রাক্ষোদেবো দক্ষিণ হস্তে আ দধত।

তয়াহং সর্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্রঃ উত্যাৰ্য্যঃ ॥

তিনি সহস্র অক্ষি পুরুষ (অর্থাৎ অনন্ত ও জ্ঞানময় পুরুষ), তিনি আমাকে দক্ষিণ হস্তে স্থাপনা করিয়াছেন (অর্থাৎ আমাকে তিনি তঁাহার কর্ম সম্পন্ন করিতে কর্মী করিয়াছেন)। তঁাহার জ্ঞানময় দৃষ্টিতে আমি আর্য্য (পন্ডিত) এবং শূদ্র (অশিক্ষিত) সকলকে দর্শন করি। অথর্ব্ব কান্ড ৪, সূক্ত ২০ ॥

তোমরা যদি গীতা পাঠ কর তবে বেদের কর্ম, বেদের উপাসনা ও বেদের জ্ঞান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারিবে। গীতাকে একটা ছোট বেদ বলা চলে। গীতার আধুনিক ব্যাখ্যা ও টীকাকারদের মধ্যে শক্তিবাদী বড় কেহ নাই, এজন্য গীতার বাস্তব জীবন সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত অন্ধ থাকিয়া যাইতেছি। গীতার টিপনীকারদের মধ্যে ভাববাদী ও পৌরোহিত্যবাদীদের প্রভাব খুব বেশী। তঁাহারা বেদের বাস্তব জীবন হইতে আমাদের বঞ্চিত করিয়া দিয়াছেন।

তোমরা যদি দর্শনশাস্ত্র পাঠ কর তবে দেখিতে পাইবে - সৃষ্টির মূলে এক প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। এই নিয়মের নাম ত্রিগুণ - সত্ত্ব, রজঃ, ও তম। এই তিন গুণের বৈষম্যের জন্যই মানুষের প্রকৃতি একরূপ হয় না। তিন গুণের বৈষম্যই কর্মেরও ভেদ হইয়াছে। হাজার চেষ্টা কর, মানুষের প্রকৃতি, কর্ম ও প্রবৃত্তি কিছুতেই একরূপ হইবে না। সকলের মন একই কাজের জন্য একরূপে উপযুক্তও হয়না। সমাজ-জীবন ও প্রাকৃতিক নিয়মে এইরূপ বৈষম্যে সমাজ প্রস্তুত থাকিবার দরুণ একই কাজ দ্বারা সমাজ নিয়মিত হয় না।

সমাজের মধ্যে কেহ কেহ সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ (ব্রাহ্মণ), কেহ কেহ সত্ত্ব-রাজস প্রকৃতির (ক্ষত্রিয়), কেহ কেহ রজ-তামস প্রকৃতির (বৈশ্য), কেহ কেহ তামস প্রকৃতির (শূদ্র), আবার কেহ কেহ তমঃ প্রধান রাজস প্রকৃতির বা আঙ্গুরিক প্রকৃতির মানুষ হইয়া

থাকে। যাহার যেমন প্রকৃতি এবং যাহার যেমন কর্মশক্তি সে সমাজজীবনে সেইরূপ কর্ম বাছিয়া লয়। ক্রমে বংশ পরম্পরাতে যদি একই বৃত্তি বা কর্মের অনুশীলন হইতে থাকে তবে সেই বংশকে সকলেই সেই বৃত্তির বা জাতের লোক বলিবে ইহাই স্বাভাবিক। কর্মভেদের জন্যই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু যদি তোমরা মানুষের স্বভাব ও কর্মকে বাদ দিয়া বিশুদ্ধভাবে একজনকে দেখ তবে দেখিতে পাইবে সব মানুষই একই আত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ। এইজন্য সন্ন্যাসীর জাতি নাই।

জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমাদের জীবন কতকগুলি কর্তব্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। এই কর্তব্যগুলিই 'কর্ম'। আমাদের শরীরে ও মনে গুণের তারতম্য আছে। এই জন্যই আমাদের স্বভাব ও কর্মভেদ স্বাভাবিক। এই স্বভাবের সঙ্গে জন্মগত বৈশিষ্ট্য যে খুব বেশী সম্বন্ধ রাখে ইহা বলা যায় না।

আমাদের সমাজে জন্মগত কারণে কাহাকেও উচ্চ বা হীন ভাবার কিছুটা ভ্রান্ত শিক্ষার নিয়ম আছে। এই ভ্রান্ত শিক্ষা ভিন্ন জন্মগত বিধানে এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম নাই যে কেহ উচ্চ হইয়া যাইবে বা কেহ নীচ হইয়া যাইবে। তবে বংশগতভাবে আমরা কতকগুলি উচ্চ ও বৈজ্ঞানিক আচার ব্যবহার এবং বংশগতভাবে আমরা কতকগুলি অবৈজ্ঞানিক আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া থাকি। যাহাতে সকলের বংশে একই উচ্চ ও বৈজ্ঞানিক আচার ব্যবহার প্রবর্তিত হয়, এই জন্য শিক্ষা জীবনেই আমাদের সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। তোমরা বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত সমাজশাখাতে উচ্চ ও বৈজ্ঞানিক আচারধর্ম প্রবর্তন করিতে সচেষ্ট হইবে।

জ্ঞান প্রধান কর্ম, অস্ত্র ধারণ কর্ম, কৃষি ও ব্যাপার এবং মজুরীর কর্ম; কর্মের এই চার প্রকার ভেদ স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মের সহিত বংশগত কোনই সম্বন্ধ নাই। এক যুগে আমার পূর্বপুরুষগণ অস্ত্রধারণ করিলে এই যুগে আমি জ্ঞানের চেষ্টা করিতেছি, বা এক যুগে আমার পূর্বপুরুষগণ মজুরের কাজ করিলেও এই যুগে আমাদের পিতা ও আমি রণবিদ্যায় দক্ষ হইয়াছি। একই ঋষির চার পুত্র; একজন জ্ঞান প্রধান কর্ম করেন, একজন যোদ্ধা, একজন কৃষক ও একজন মজুর। মজুরের ছেলেটি যদি জ্ঞান প্রধান কর্ম করে তবে তাহাকে মজুর বলা অবৈজ্ঞানিক হইবে না কি? এক যুগে আমার পূর্বপুরুষগণ জ্ঞানের চর্চা করিতেন, এইযুগে আমি পাচকের কাজ করি, আমি জ্ঞানী কোথায় রহিলাম?

অনেক স্থানে দেখা যায় 'শূদ্র' শব্দ ঠিক গালিগালাজের স্থান অধিকার করিয়াছে। মজুরের কাজ কি সত্যই কোন অপরাধীর কাজ? কোন ঋপ্রাচীন যুগে কাহারও পূর্বপুরুষ যদি মজুরের কাজ করিয়া সমাজ সেবা করিয়া থাকে তাহাতে সে এমন কি অন্যায় কাজ করিল যে যুদ্ধ দ্বারা সমাজ সেবকের বংশ হইতে সে নিকৃষ্ট হইয়া যাইবে? একজন লোক কোন চুরি করিল না, অনাচার অত্যাচার করিল না, মিথ্যা বলিল না, তবে সে অপরাধী? তোমরা জানিয়া রাখিও এসব পৌরোহিত্য দস্যুদের কুকাণ্ড। এই দস্যুতা ভাঙ্গিয়া দিবে, যাহাতে সব রকম মানুষের জন্য কর্ম বর্জন ব্যবস্থা থাকে। এইজন্য প্রাচীনকালে রাজশক্তির যথেষ্ট সাবধানতা ছিল। মধ্যযুগে এই সাবধানতায় যথেষ্ট শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল। এইজন্য মধ্যযুগে এই পৃথিবীতে নানাপ্রকারের সমাজ বিপ্লবের আবির্ভাব হইয়াছিল। এখন রাজশক্তি বা স্টেট অনেকস্থলে সেইজন্য যথেষ্ট সাবধান হইয়া

উঠিতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ। অনেকে উৎপাদনের কারণগুলিকে সবই ষ্টেটের হাতে দিবার পক্ষে। আমরা উহাকে কোন দূরদর্শীনীতি বলিয়া স্বীকার করি না। আমাদের দেশে বৃত্তি-গ্রহণ বংশপরম্পরায় হইতেছিল। ইহাও ভাল নীতি।

আঙ্গুরিক লক্ষণ সম্পন্নগণ, চুরি ডাকাতি, গুণ্ডামি, বদমাইসী, নারীহরণ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ইত্যাদি করিয়া সমাজের অনিষ্ট করে। ইহাদের বিরুদ্ধে রাজশক্তি ও সমাজের কঠোর বিধান থাকা প্রয়োজন। ইহাদের জন্য তোমরা অত্যন্ত কঠোর নীতির সমর্থক হইও। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া গীতা আদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রে ইহাদিগকে অঙ্গুর নাম দেওয়া হইয়াছে। এবং এই শ্রেণীর উপর কঠোর নীতির সমর্থক হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আঙ্গুরিক লক্ষণ ও ঠগ-লক্ষণযুক্ত কোন সমাজকেই ভ্রান্তিবশে নিজেদের পরিজনে মিশিতে দিবে না। ইহাতে সর্বদাই মন্দ ফল হইয়া থাকে।

তোমরা পিতা, মাতা, ভাই, বোন, গুরু, শিক্ষক ও অন্যান্য আত্মীয়দের প্রতি কর্তব্যশীল হইবে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যেও অবহেলা করিবে না। সকলকে সৎ পরামর্শ দিবে। স্বাস্থ্য রক্ষা ও উপার্জনে নিষ্ঠা রাখিবে। এই সবই কর্মধর্মের অন্তর্গত কথা জানিবে।

আচার ও শিষ্টাচার ও কর্মধর্মেরই অঙ্গ জানিবে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কতগুলি আচার বিধান আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। সেইগুলি তোমরা অবশ্যই পালন করিবে। যথা- প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, মলমূত্র ত্যাগ, দাঁতন করা, মুখ-ধোয়া, স্নান, কাপড় কাচা, স্বাবলম্বী হওয়া, ব্যায়াম করা, আহারান্তে মুখ ধোয়া, মাদক দ্রব্য ব্যবহার না করা, চা আদির অভ্যাস না রাখা, মলমূত্র ও উচ্ছিষ্ট বাসস্থান হইতে দূরে পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। এই পৃথিবীতে হিন্দুদের আহার প্রস্তুত প্রণালী অত্যন্ত পবিত্র। উহা পালন করিবে। আহার্য বস্তুর নিকটে হাঁচি, কাশি, বা কোন প্রকার নোংরামি করিবে না। আহারে ও পানীয় বস্তুতে উচ্ছিষ্টবিধান মান্য করিবে। ইহা স্বাস্থ্য রক্ষার অতীব প্রয়োজনীয় নিয়ম। পানান্তে গ্লাস এবং ভোজনান্তে থালা, বাটী ইত্যাদি শুদ্ধ মাটির দ্বারা মাজিয়া ধুইয়া রাখিবে। একজনের উচ্ছিষ্ট বাসনের খাদ্য ও পানীয় কখনও পান করিবে না। ইহার দ্বারা কঠিন সংক্রামক রোগ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে নীত হয়। মুখের মধ্যে ময়লা হাত প্রবেশ করাইবে না এবং মুখে হাত দিবার পর হাত ধুইবে।

শিষ্টাচারের মধ্যে গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা বোঝায়। কাহারও সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছা থাকিলে ওঁ নমঃ, ওঁ ভদ্রঃ, ওঁ নমস্কার, ওঁ নমস্তে, বা প্রণাম ইত্যাদি শিষ্টাচার দেখাইয়া আলাপ করা ও উক্ত নিয়মে বিদায় দেওয়ার অভ্যাস রাখিবে। বিশেষ গুরুজনকে বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাইয়া শিষ্টাচার দেখাইবে এবং “ওঁ নমো নমঃ” বলিবে। যখনই প্রিয়জনের সহিত সাক্ষাৎ হইবে তখনই ঐরূপ শিষ্টাচারের অভ্যাস করিবে। মহাত্মাগণকে “ওঁ নমো নারায়ণায়” বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইবে। মনে রাখিবে শিষ্টাচার প্রদর্শনে কোনই খরচা নাই কিন্তু ইহাদ্বারা আমাদের মনুগ্রন্থ লাভের শ্রেষ্ঠ স্বেযোগ পাইয়া থাকি।

সমাজ জীবনের কর্তব্যকে স্নন্দরভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রে আমাদের জীবনকে ১০০ বৎসর মানিয়া লইয়া চার ভাগ করা হইয়াছে। যথা - ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। প্রত্যেক ভাগে ২৫ বৎসর জানিবে। শিক্ষার জীবনকেই ব্রহ্মচর্য্য জীবন জানিবে।

এসময় সংযম অবলম্বন করিয়া বিদ্যা অর্জন করিতে হয়। গার্হস্থ্য জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্য উপার্জন ও সমাজ পালন। বানপ্রস্থকালে নিজের আত্মজ্ঞান লাভ করা ও অন্যকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা শিক্ষা দেওয়া, সন্ন্যাস জীবনের অর্থ হইতেছে জ্ঞানময় জীবন। ইহা ভোগ, মোহ ও অহং শূন্য (অনহং) কর্ম ও জ্ঞানময় জীবন। অনেকে ব্রহ্মচর্য্য বা গার্হস্থ্য জীবন হইতেও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তোমরা সমস্তটা জীবনই সতেজ থাকিতে চেষ্টা করিবে। দেখিতে পাইবে জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা তোমাদের চিন্তাধারা ঠিক ঐ চারটা ধারাতে আপনিই গড়িয়া উঠিতেছে।

ঋষিগণ আমাদের শিক্ষার জীবন মাতৃগর্ভ হইতে নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং কতগুলি আশ্চর্য্য বৈদিক সংস্কারের প্রবর্তন করিয়াছেন। যথা - গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নিষ্কামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণভেদ, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, সমাবর্তন, বিবাহ। প্রথম তিনটি সংস্কার মাতৃগর্ভে হইয়া থাকে। পরের তিনটি সংস্কার অত্যন্ত বাল্যকালে অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ৫ বৎসরের মধ্যে পরবর্তী তিনটি সংস্কার দিতে হয়। ৫ বৎসরের পর ১৬ বৎসরের মধ্যে উপনয়ন ও বেদারম্ভ সংস্কারের সময়। ইহার পর শিক্ষাকাল শেষ হইলে কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়া পিতামাতার নিকট ফিরিয়া আসাই 'সমাবর্তন'। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের নাম 'বিবাহ' সংস্কার।

সন্ন্যাস জীবনোচিত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য অনেকগুলি সংস্কার আছে, সেই সংস্কারগুলির নাম 'দীক্ষা'। দীক্ষার ক্রম আছে, যথা - (১) শাক্ত দীক্ষা, (২) পূর্ণ দীক্ষা, (৩) ক্রম দীক্ষা, (৪) সাম্রাজ্য দীক্ষা, (৫) মহা সাম্রাজ্য দীক্ষা, (৬) যোগ দীক্ষা, (৭) মহাপূর্ণ দীক্ষা, (৮) সন্ন্যাস।

কিরূপ ভীষণ কঠোরতার মধ্যে দিয়া হিন্দুরা নিজেদের সমাজ জীবনকে গড়িবার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা তোমরা এসব সংস্কারগুলির বিজ্ঞান আলোচনার দ্বারা বুঝিতে পারিবে।

এইসব সংস্কারগুলি অতি সামান্যই এখন সমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সংস্কার গুলির কিছু অংশ পুরোহিতগণের উপার্জনের জন্য এখনও প্রচলিত আছে। দীক্ষার ধারাগুলি এখন একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এবং ভাববাদী মহাত্মাগণ সস্তায় ভাববাদ ছড়াইয়া সমাজের চিত্তকে এমন দুর্বল করিয়া দিয়াছেন যে একজন হিন্দুনারী রাস্তা দিয়ে গুপ্তার ভয়ে একা কোথাও যাইতে সাহস পায় না। দেশের স্বাধীনতা, স্বরাজ, শক্তি সবই ১৫০০ বৎসরের বিস্মৃত স্বপ্নে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। (সংস্কার বিষয়ে শক্তিশালী সমাজ বই দেখ)।

বর্তমান কর্ম্মধর্ম্মের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা দেশের স্বাধীনতা লাভ। স্বাধীনতাহীন সমাজ বিকাশের অনুকূল হয় না। আবার ঝাঁহারা আঙ্গরিক ও বর্করগণকে প্রশ্রয় দিয়া সস্তায় স্বরাজ লাভ করিবার কথা ভাবেন তাঁহাদের নেতৃত্বে বিশ্বাস করা যায় না। প্রায় ১০০০ বৎসর ধরিয়া আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরাধীন হইয়া পড়িয়াছি। ইহাকে উদ্ধার করিবার জন্য বেশ ভালভাবে চেষ্টা হইলে ইহা অনেক পূর্বে উদ্ধার হইয়া যাইত। সমাজ জীবনে এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী বিপদ কোন দেশ ভোগ করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।

জানিয়া রাখিও হিন্দু ধর্ম কোন শক্তিহীন ধর্ম নহে। ভাববাদিতা এবং পৌরহিত্যবাদিতা আমাদিগকে পরাধীন করিয়াছে এবং পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে সমাজকে গুণ্ডার হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মহারাজ পৃথ্বীরাজ আঙ্গরিক লক্ষণযুক্ত মহম্মদ ঘোড়ীকে ১৭ বার পরাস্ত করেন এবং ভাববাদিতা বশতঃ ছাড়িয়া দেন। ইহারই ফলে আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে পরাধীন হইয়া পড়ি। বেদ কর্ম-ধর্মের এই স্বরাজ লাভের অংশকে একটুও ছোট করে দেখেন নাই। এ সম্বন্ধে বহু মন্তব্য বেদে আছে। কিন্তু কোন মন্তব্যই ভাববাদিতার সমর্থন দেখা যায় না।

একটি মাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

যথা - ঔ প্রহভীতি ধ্বক্ষু হৈ ন তে বজ্রো নিশংযতে।

ইন্দ্র নৃক্ষং হি তে শবো হনো বৃত্রং জয়ঃ

অপর্চন্নুতু স্বরাজ্যম্॥

হে ইন্দ্র (নেতা) স্বরাজ্য পাওয়ার জন্য সাধনা করিতে করিতে তুমি অগ্রসর হও। সম্মুখে এসো (অর্থাৎ ভয় পাইও না)। তুমি বাধা অতিক্রম কর। তোমার বজ্র কখনও পরাজিত হয় না। (অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবহারে তুমি বিচলিত হইও না)। হে ইন্দ্র (নেতা) তুমি নিশ্চয়ই স্বরাজ্যরূপ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে (অর্থাৎ স্বরাজ্যের চেষ্টা ব্যর্থ হয় না)। তুমি নিজের শক্তি দ্বারা বিদ্রূপ বাধাকে ধ্বংস কর এবং সর্বকর্ম্যে জয় লাভ কর। সামবেদ, ৫ম প্রপাঠক। ৩ দশম ॥ মন্তব্য ৪১৩ ॥

## উপাসনা

নিত্য কর্তব্য উপাসনা ও নৈমিত্তিক কর্তব্য উপাসনা, উপাসনার এই দুই প্রকারের ভেদ আছে। দিন রাত্রে মধ্য এই পাঁচটি সন্ধি-কাল বাহির করা হইয়াছে। এই পাঁচ সন্ধিয়া উপাসনার নাম “নিত্য কর্তব্য উপাসনা”। এই পাঁচটির মধ্যে তোমরা যদি তিনটি উপাসনা (সকাল, মধ্যাহ্ন, সায়ং) কর তবে উহা তোমাদের শরীর ও মনের বিশেষ অনুকূল হইবে। যাহারা ইহাতেও অক্ষম তাহারা একটি সঙ্কেতপাসনা করিবে (প্রাতঃ, সায়ং)। “সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তুরীয়া ও ব্রহ্ম” ব্রহ্ম জ্ঞানের এইরূপ পাঁচটি স্তর আছে। অর্থাৎ এই পাঁচটি স্তরের যথাযথ জ্ঞানই ব্রহ্ম জ্ঞান। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং, মধ্য রাত্রি ও ব্রহ্ম মুহূর্ত এই পাঁচটি সময়ে ব্রহ্ম-জ্ঞানের এই পাঁচটি স্তর বেশ স্পষ্ট হয়। সময়ের প্রকৃতিতে এই পাঁচটি জ্ঞানের বিকাশ সাধকগণকে ব্রহ্ম জ্ঞানে সাহায্য করে বলিয়া উপাসনার জন্য এই পাঁচটি সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

## উপাসনা কি ?

যাহা কিছু স্মন্দর, জ্ঞানময়, ত্প্রিময়, ত্যাগময়, পবিত্র ও পূর্ণ উহা আত্মারই বর্হিলক্ষণ। এজন্য সেই সব বস্তু বা তত্ত্বের দিকে আমাদের মনের একটি স্বাভাবিক ও

পবিত্র আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণের নামই উপাসনা। তোমরা ‘ভক্তি’ বলিতে যাহা বোঝা উহারই নাম উপাসনা। উপ = সমীপ। আসন = স্থিত হওয়া বা বসা। উন্নত নিকটস্থ হওয়া অথবা ঈশ্বর, আত্মা বা ব্রহ্ম তত্ত্বে শ্রদ্ধাময় অনুষ্ঠানই উপাসনা। উপাসনার অনুষ্ঠান না করিলে আমাদের মন অন্তরমুখী হয় না। কাজেই মনের শান্তি ও জ্ঞান লাভ করিবার জন্য উপাসনা অত্যন্ত আবশ্যিক। যাহারা উপাসনা করে না তাহারা ভাল কর্ম্মী হইতে পারে না। কাজেই তোমরা একদিনও উপাসনায় অবহেলা করিবে না। সমস্ত জীবনের মধ্যে উপাসনা সবচেয়ে পবিত্র অনুষ্ঠান। হিন্দুদের উপাসনা বিধি এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে স্কন্দর ও উচ্চ দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। মানুষের মনোবিকাশ ও মনুগ্ৰহ লাভের জন্য এই উপাসনা আশ্চর্য্য প্রকারের দৈব অনুষ্ঠান।

নৈমিত্তিক উপাসনা বৎসরের বিশেষ কোন দিনে বা মাসের মধ্যে বিশেষ কোন তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। নৈমিত্তিক উপাসনা নিত্য করিবার প্রয়োজন হয় না। নিত্য করিবার প্রয়োজন হয় না। নিত্য, নৈমিত্তিক ভেদে উপাসনায় মোট সাতটি প্রকার আছে।

- ১। নিগুণ ব্রহ্ম উপাসনা বা মহাশক্তি উপাসনা। ইহাকে সঙ্কেতপাসনা বলে।
- ২। সগুণ ব্রহ্ম উপাসনা বা পঞ্চ দেবতা উপাসনা।
- ৩। অবতার উপাসনা।
- ৪। মহাপুরুষ উপাসনা।
- ৫। দেবতা উপাসনা।
- ৬। পিতৃ উপাসনা।
- ৭। প্রেত উপাসনা।

## নিগুণ ব্রহ্মোপাসনা

নিগুণ ব্রহ্ম উপাসনা আমাদের সর্ব প্রধান উপাসনা। অন্যান্য উপাসনা এই উপাসনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। সোজা ব্রহ্মজ্ঞানের স্তর কাহারও লাভ হয় না। এইজন্য উপাসনার শাখা-ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছে। তোমরা নিত্য সঙ্কেতপাসনা করিবে। সঙ্কেতপাসনা না করিলে ধর্মের কোন কথাই তোমরা জানিতে পারিবে না। যদি তোমরা নিত্য সঙ্কেতপাসনা না কর তবে নিজের শরীর ও মনের পুষ্টিতে যথেষ্ট ক্ষতি সহ করিবে। নিত্য যেমন আমাদের শরীর ক্ষয় পরিপূরণ করিবার জন্য আহার গ্রহণ করিতে হয় ঠিক সেইরূপ নিত্য মনের ক্ষয় পরিপূরণ করিবার জন্যও বৈজ্ঞানিক উপাসনা করিতে হয়।

বেদে সকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়ং কালীন উপাসনার উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। যোগিগণ ও উন্নত স্তরের সাধকগণ মধ্য রাত্রি ও শেষ রাত্রি কালে সঙ্কেতপাসনা করেন। বেদে শেষ রাত্রি ও সূর্য্যোদয়ের মাঝামাঝি সময় ব্রাহ্ম-সঙ্ক্যার উপদেশ দিয়াছেন। এই সঙ্ক্যাকে যদি সূর্য্যোদয়কালে করা যায় তবে উহা ‘ব্রহ্মাণী’ বা সৃষ্টিকারিণী শক্তির উপাসনায় পরিণত হয়। তোমরা সূর্য্যোদয়ের পূর্বে প্রাতঃ সঙ্ক্যার অনুষ্ঠান করিবে। এই সঙ্কেতপাসনা অতীব স্কন্দ। দুই চার দিন অনুষ্ঠান করিবার পরেই তাহা বৃষ্টিতে পারিবে। সঙ্ক্যগুলিকে ব্রহ্মাণী-সঙ্ক্য (প্রাতঃ), বৈষ্ণবী-সঙ্ক্য (মধ্যাহ্ন), সায়ং-সঙ্ক্য

(শিবানী), তুরীয় সঙ্ক্যা (মধ্য রাত্রি বা শয়নের পূর্বে শয্যায় বসিয়া করিলেই চলে। এই সঙ্ক্যাই ‘কালী’ নামে খ্যাতা), ও ব্রহ্ম সঙ্ক্যা বলা হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ব্রহ্ম সঙ্ক্যা করিতে হয়। আমাদের শরীরের মধ্যে আত্মাই আসল সত্ত্বা। নিত্য ত্রিসঙ্ক্যানুষ্ঠান করিলে বায়ু, পিত্ত, কফ সাম্য থাকে। এই জন্ম শরীর ও মন সাম্য থাকে; স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এইজন্য এই শরীরে আত্মার নিবাসের যোগ্যতা বৃদ্ধি হয়। কাজেই দেখিতে পাইতেছ আয়ু ও স্বাস্থ্য লাভের জন্ম সঙ্ক্যোপাসনা করা কর্তব্য। যাহাতে তোমরা নিত্য সহজে অথচ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তিতে সঙ্ক্যোপসনা করিতে পার এইজন্য তিন প্রকারের সঙ্ক্যাবিধি বলা যাইতেছে - (১) সংক্ষেপ, (২) অতিসংক্ষেপ ও (৩) বিস্তারিত।

প্রথম সংক্ষেপে বিধি বলা যাইতেছে। সঙ্ক্যাবিধি সমবেত অনুষ্ঠান করিলে বেশী শক্তিশালী হয়। তোমরা প্রাতঃসঙ্ক্যা একা একা করিবে, এবং সায়েং সঙ্ক্যা সমবেত ভাবে করিবে। অন্যান্য সঙ্ক্যা যেমন স্তবিধা করিবে।

প্রাতে পূর্বাভিমুখে ও অন্যান্য সময়ে উত্তরাভিমুখী হইয়া করিবে। যদি বসিবার স্তবিধা না থাকে তবে দাঁড়াইয়া উপাসনা করিবে। সমবেত উপাসনায় প্রথম প্রথম একজনকে অগ্রগায়ক করিবে। যাহার স্বর সকলের বেশী অনুকূল তাহাকে অগ্রগায়ক করিবে। সঙ্ক্যানুষ্ঠানের পূর্বে হস্ত, পদ, মুখ প্রক্ষালন করিলে সঙ্ক্যানুষ্ঠান বেশী শক্তিশালী হয়। অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া বা বিশেষ কোন ব্যাধি লইয়া সমবেত উপাসনায় যোগদান করিতে লইলে একটু দূরে অবস্থান করিয়া উপাসনা করিবে।

### সংক্ষেপে সঙ্ক্যার ক্রম

১। মূলাধারে কুন্ডলিনী নামক মহাশক্তিকে ধ্যান করিবে। মূলাধারে বিদ্যুৎ কণা বা বিদ্যুৎ লতার মত ইহাকে ২, ৫ সেকেন্ড ধ্যান করিলেই চলে।

২। সহস্রারের মধ্য স্থলে পরব্রহ্ম (শুদ্ধ স্ফটিক বর্ণ বিন্দু) ধ্যান করিবে। সহস্রারের কেন্দ্র স্থলকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে। ইহাই ব্রহ্মস্থান। মস্তিষ্কের একেবারে শেষপ্রান্তে এই কেন্দ্র বিদ্যমান। মস্তিষ্কস্থিত নাড়ী ও কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৪ চিহ্নিত কেন্দ্র।

**প্রাণায়াম।** মূলাধারে কুন্ডলিনী শক্তিকে ধ্যান করিবার পর মহাব্যাহতি মন্ত্র স্মরণ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয়। পূরক, রেচক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের এই তিনটি জিন্মা আছে। দক্ষিণ নাসাপুট ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা টিপিয়া ধরিতে হয় এবং বাম নাসায় বায়ু ধীরে ধীরে টানিতে হয়। শ্বাস টানিবার সময় নাভিস্থানে অর্থাৎ মণিপূরে মনকে একাগ্র রাখিবার জন্ম সেখানে রক্ত বর্ণ ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে হয়। একটি রক্ত বর্ণ ছোট শিবলিঙ্গ বা একটি লাল বর্ণ দীপকলিকা মণিপূরে (ব্রহ্মনাড়ী পরিচয় চিত্রে ৩নং কেন্দ্রে) ধ্যান করিতে করিতে পূরক করিবে। পূরক হইয়া গেলে অনাহত স্থানে (ব্রহ্মনাড়ী পরিচয় চিত্রে ৪নং কেন্দ্রে) মনকে একাগ্র রাখিতে হয়। এইজন্য অনাহতে বিষ্ণু ধ্যান (নীল বর্ণ দীপ কলিকা) করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া বায়ু রুদ্ধ রাখিবে এবং দক্ষিণ ও বাম নাসাপুট অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা সহযোগে টিপিয়া বন্ধ করিয়া দিবে। নাসা পথ রুদ্ধ করিয়া মনে মনে মহাব্যাহতি পাঠ করিবে। ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ করাকে রেচক বলে।

বাম নাসা বন্ধই রাখিবে এবং দক্ষিণ নাসা পথ খুলিয়া দিবে এবং ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ করিবে। রেচন কালে মনে মনে মহাব্যাহতি পাঠ করিবে।

এইভাবে বায়ু রেচন হইবার আবার পূরক করিতে হইবে। এবার পূরক কালে ডান নাসায় বায়ু টানিতে হইবে। এবং যথাবিধি কুম্ভক করিবার পর বাম নাসায় রেচক ক্রিয়া করিতে হইবে। ইহা দ্বারা দ্বিতীয় বারের প্রাণায়াম হইল।

দ্বিতীয় বারের প্রাণায়াম হইয়া যাইবার পর তৃতীয় বারের প্রাণায়াম করিবে। এই প্রাণায়ামে পূর্বক ক্রিয়া পূর্ব লিখিত প্রথম প্রাণায়ামের মত বাম নাসায় আরম্ভ হইবে এবং পূরক ও রেচক আদি সব ক্রিয়া প্রথম প্রাণায়ামের মত সম্পন্ন করিতে হইবে। এইরূপ তিনবারের প্রাণায়ামে একটী প্রাণায়াম হইয়া থাকে।

প্রাণায়ামকে আরও শক্তিশালী ও উন্নত করিবার জন্য ইহাকে মূল বদ্ধ, উড্ডীয়ান বদ্ধ ও জালাঙ্কর বদ্ধ ক্রিয়া যোগ করিতে হয়। এই সব ক্রিয়া অভিজ্ঞ যোগীর নির্দেশ ভিন্ন করা যায় না। তবে পূরক, কুম্ভক ও রেচক সংযুক্ত প্রাণায়াম যে কোন লোকের নিকট শিক্ষা করিয়া লইতে পারিবে।

এই প্রাণায়ামকে বৈদিক প্রাণায়াম বলে। ইহাতে পূরক, কুম্ভক ও রেচক ক্রিয়ার সময় এক সমান থাকে। যোগের অধিকাংশ প্রাণায়ামই পূরক ১, কুম্ভক ৪ এবং রেচক ২ বিধানে হইয়া থাকে। প্রাণায়ামে মন অন্তর্মুখী হয়, আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং মন ব্যাপক হইতে স্বেযোগ লাভ করে। তোমরা যতদিন প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে পারিবে না ততদিন প্রাণায়ামের পরিবর্তে ৩, ৪, ৫ সূত্র অনুসরণ করিবে।

৩। পুনঃ মূলাধারে মহাশক্তি ধ্যান করিবার পর মণিপূরে (ব্রহ্ম নাড়ী চিত্রে ৩ নং কেন্দ্রে) ব্রহ্মাকে ধ্যান (একটী রক্ত দীপ কলিকা বা শিবলিঙ্গ ধ্যান) করিয়া মহাব্যাহতি পাঠ করিবে। যথা - ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁ তৎসবিতুর্বারেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ আপো, জ্যোতি, রসঃ, অমৃতং ব্রহ্ম, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, ওঁ। (তিনি ভূলোক স্বরূপ, তিনি ভুবঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোক স্বরূপ। তিনি সবিতা দেবতার পূজনীয় তেজ স্বরূপ, তাঁহাকে ধ্যান করি, তিনি আমাদের বুদ্ধিতে নিজের শক্তি প্রেরণ করুন। তিনি আপঃ (জীবন) স্বরূপ, তিনি জ্যোতি (তেজ, বীর্য), তিনি রসঃ স্বরূপ অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ, তিনি অমৃত (অমর আত্মা), তিনি ব্রহ্ম স্বরূপ, তিনি ইচ্ছা, তিনি ক্রিয়া, তিনিই জ্ঞান স্বরূপ, তিনিই ওঁ স্বরূপ।)

৪। পূর্বেব্রাহ্মরূপে মহাব্যাহতি পাঠ করিবার পর অনাহতে বিষ্ণুকে (নীলবর্ণ দীপ কলিকা বা শিবলিঙ্গ) ধ্যান করিয়া মহাব্যাহতি (ওঁ ভূঃ ইত্যাদি) পাঠ করিবে।

৫। এইরূপ অনাহত ধ্যান করিয়া মহাব্যাহতি পাঠ করিবার পর আজ্ঞা চক্রের মধ্যস্থিত শিব পিন্ডে (ব্রহ্ম নাড়ী চিত্রে ৬ নং কেন্দ্রে) শ্বেত বর্ণ শীতল শিবলিঙ্গ বা দীপ কলিকা ধ্যান করিয়া মহাব্যাহতি (ওঁ ভূঃ ইত্যাদি) পাঠ করিবে।

৬। তোমরা পূর্বেব্রাহ্ম নিয়মে প্রাণায়াম করিবে অথবা ৩, ৪, ৫ সূত্র অনুসরণ করিয়া মহাব্যাহতি পাঠ করিয়া মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত ব্যাপ্ত ব্রহ্ম নাড়ী ধ্যান করিয়া গায়ত্রী তিন বার বা ১০ বার করিবে এবং ব্রহ্ম স্তোত্র পাঠ করিবে।

৬। (ক) গায়ত্রী :- ॐ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ভরগণ্যম্ ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ধियो যো  
নঃ প্রচোদয়াৎ ॐ ॥

তিনি (ব্রহ্ম, মহাশক্তি বা পরমাত্মা) ॐ স্বরূপ, তিনি ভূ ভুবঃ এবং স্বঃস্বরূপ, তিনি  
সবিতু দেবতার পূজনীয় তেজ, তাঁহাকে ধ্যান করি, তিনি আমাদের বুদ্ধি শক্তিতে নিজের  
শক্তি প্রেরণ করুন।

৬। (খ) ব্রহ্মস্তুত্রম্ -

ॐ নমস্তে সতে সর্ব লোকান্তায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।

নমোহুদৈতত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গণায় ॥ ১

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরণ্যম্ ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।

ত্বমেকং জগৎ কর্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ, ত্বমেকং পরং নিষ্কলং নির্বিকল্পম্ ॥ ২

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্, গতিঃ প্রাণীনাং পাবনং পাবনানাম্।

মহাশৈঃ পদানাং নিয়ন্তু ত্বমেকং, পরেশাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্ ॥ ৩

পরেশ প্রভো সর্বরূপোহবিনাশহনির্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।

অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগৎভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥ ৪

তদেকং স্মরামঃ তদেকং ভজামঃ তদেকং জগৎ সাক্ষীরূপং নমামঃ।

সদেকং নিধানম্ নিরালম্বমীশং ভবাস্তোষিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৫

পঞ্চ রত্নমিদং স্তুত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।

যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা ব্রহ্ম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥

ব্রহ্ম স্তুত্রের অর্থ -

ॐ সমগ্র বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ ‘সৎ’ (ব্রহ্মকে) কে প্রণাম। বিশ্বরূপাত্মক ‘চিত্’  
(ব্রহ্মকে) কে প্রণাম। অদ্বৈত তত্ত্ব ও মুক্তি দান কারী তোমাকে প্রণাম, নির্গণ ও ব্যাপক  
ব্রহ্মকে প্রণাম ॥ ১ ॥ তুমিই একমাত্র শরণ্য (যাঁহারা আশ্রয় লওয়া যায়), তুমিই একমাত্র  
পূজনীয়, তুমিই একমাত্র জগতের ‘কারণ’ ও বিশ্বরূপ। তুমিই একমাত্র পরম (শ্রেষ্ঠ),  
নিষ্কল (যে তত্ত্বের ক্ষয় অথবা অংশ হয় না) এবং নির্বিকল্প (বিকল্প রহিত) ॥ ২ ॥ তুমি  
ভয়ের ভয়, ভীষণেরও ভীষণ; প্রাণীদের গতি (প্রাণীদের লক্ষ্য অর্থাৎ বিকাশের শেষ  
স্তর)। পাবনের পাবন (পবিত্রকারীদেরও পবিত্রকারী), তুমি সমস্ত পদের শ্রেষ্ঠ পদ, তুমি  
একমাত্র (সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের) নিয়ন্তা; যাহা শ্রেষ্ঠ তুমি তাহারও শ্রেষ্ঠ; রক্ষকদের মধ্যে  
তুমিই শ্রেষ্ঠ রক্ষক ॥ ৩ ॥ হে প্রভো, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর, তুমি সর্বস্বরূপ হইলেও  
তোমাকে বুঝা যায় না এবং তুমি সর্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও সত্য স্বরূপ। তুমি অচিন্ত্য,  
অক্ষর, ব্যাপক ও অব্যক্ত তত্ত্ব, তুমি জগৎ ভাসকাধীশ (যাহা দ্বারা জগৎ আলোকিত হয়  
উহার ঈশ্বর) ও ক্ষয় উদয় রহিত ॥ ৪ ॥ একমাত্র তোমাকে স্মরণ করি, একমাত্র  
তোমাকেই জপ করি এবং জগতের সাক্ষীস্বরূপ একমাত্র তোমাকেই প্রণাম করি। তুমি  
একমাত্র ‘সৎ’ একমাত্র নিধান (আশ্রয় স্বরূপ), তুমি নিরালম্ব (যিনি কাহারও আশ্রিত  
নহেন এবং সকলের আশ্রয়)। তুমি ঈশ্বর, সংসার সাগরের পোত, তোমার আশ্রয়

লইতেছি ॥ ৫ ॥ পাঁচটি রত্ন স্বরূপ এই পরমাঙ্গা ব্রহ্ম স্তোত্র; যে ইহা একাগ্র মনে পাঠ করে সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

অতি সংক্ষেপে সঙ্কেতপাসনা -

১ হইতে ৬ (খ) নং সূত্রই সংক্ষেপ সঙ্কেতপাসনা। যদি ইহা হইতেও সংক্ষেপ সঙ্কেত করিতে চাও তবে ব্রহ্ম নাড়ী ধ্যান করিয়া গায়ত্রী তিনবার পাঠ করিবে এবং ব্রহ্ম স্তোত্র পাঠ করিবে। বিস্তারিত সঙ্কেতপাসনা পুস্তকের শেষ ভাগে দেওয়া হইল।

তোমরা সঙ্কেত অনুষ্ঠান নিত্যই করিও। বিস্তারিত, সংক্ষেপ অথবা অতি সংক্ষেপ যেমন স্তবধা করিও। ইহা দ্বারা মেধা, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, আয়ু ও বিচারশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং যুক্তিবাদ প্রবল হয়। মুখের লাবণ্য, চোখের জ্যোতি ও মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি হয়। ইহাই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা। প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর ইহাই একমাত্র উপাসনা। আর সব উপাসনা ইহার শাখা প্রশাখা মাত্র। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হিন্দুরা দার্শনিক ঈশ্বরের উপাসনা জানে। অন্যান্য ধর্মের উপাসনা ইহার তুলনায় ছেলেখেলা তুল্য। অন্যান্য ধর্মের উপাসনার প্রার্থনাগুলি আমাদের উপাসনার সঙ্গে তুলনা করিলে সব বুঝিতে পারিবে।

### মহাব্যাহতি কথ্য

মহাব্যাহতি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা স্পষ্ট করা যাইতেছে।

তোমরা গীতা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে - ওমি ত্যেকাঙ্করং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ । যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ গীতা ৮-১৩ ॥ ওঁ রূপ এক অঙ্কর ব্রহ্মরূপ আমাকে ব্যাহতি সহিত স্মরণ করিতে করিতে যিনি শরীর ত্যাগ করিতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন। এই সম্বন্ধে গীতার আরও একটি শ্লোক বলা যাইতেছে; প্রয়াগকালে মনসাঃচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব। ঋবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮-১০ ॥ মৃত্যুকালে নিশ্চল মনে এবং ভক্তি ও যোগবলে প্রাণকে সম্যকরূপে ঋমধ্যস্থানে (শিবপিণ্ডে) স্থাপনা করিতে পারিলে সে পরম দিব্য পুরুষ লাভ করে ॥ ঋমধ্যস্থান ব্যাহতি জগতের একটি কেন্দ্র। এই ব্যাহতি বস্তুটি যে কি উহা বুঝিতে না পারিলে তোমাদের উপাসনার কোন লক্ষ্যই সিদ্ধ হইবে না। মৃত্যুকালে এই ব্যাহতিকে স্মরণ করিতে হইলে সমস্ত জীবনে এই ব্যাহতি স্মরণ করিবার অভ্যাস করিতে হয়। এ সম্বন্ধে বেদের ও আদেশ দেখ -

ওঁ শতঐক্যে চ হৃদয়স্য নাভ্য

স্তাসাং মূর্দ্ধগ্যমতি নিঃসৃতিতৈকা।

তয়োর্দ্ব মায়ন্নমৃতত্ব মেতি

বিশ্বঙ্ঘ্ণ্যা উপক্রমণে ভবন্তি ॥ কঠ, উ, ১২৫ ॥

হৃদয় মধ্যে (মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত স্থানের নাম হৃদয়) এক শত একটী নাড়ী আছে (ক্রম বিকাশ ৮ম অধ্যায় দেখ)। উহাদের মধ্যে একটি নাড়ী ব্রহ্ম রক্তের অভিমুখে নির্গত হইয়াছে। (মানুষ) সেই নাড়ীদ্বারা উর্দ্ধে গমন দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে। এই ব্রহ্ম নাড়ীটি ভিন্ন অন্য নাড়ী বিভিন্ন লোকে গমনের কারণ হয়।

এই ব্রহ্ম নাড়ীই ব্যাহতি। সর্বদা এই নাড়ী বা ব্যাহতি ধ্যান সহ ‘ওঁ’ জপ করিতে হয়। ব্রহ্ম নাড়ী = ওঁ = ব্যাহতি = গায়ত্রী = ব্রহ্ম স্তোত্রের ব্রহ্ম = আত্মা = পরমাত্মা = মহাশক্তি = গুরু। উন্নত যোগ বিধান বা সাধনার সাহায্যে মন যখন এই ব্রহ্ম নাড়ীতে ঠিক ঠিক প্রবেশ করিবে তখনই মন একাগ্র ও ব্যাপক হইবে। এবং তখনই জ্ঞানও হইবে। সেই সব বিধান এখানে আলোচিত হইবে না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অনেক স্থানে ‘মাং’ (আমাকে), ‘অহং’(আমি) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া ব্রহ্ম ধ্যান ও সাধনার ইসারা দিয়াছেন। আমরা কয়েকটি স্থান হইতে শ্লোক উদ্ধৃতি করিতেছি -

“পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ”। ১১-৫ ॥

হে পার্থ, আমার শত শত প্রকারের ও সহস্র সহস্র প্রকারের রূপ দেখ।

“মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি”। ১১-৭ ॥

হে জিতেন্দ্র, আরও যাহা কিছু দেখিতে চাও আমার দেহে দেখ।

“মন্ননাভব মন্তজো মদ্ যাজী মাং নমস্করু”। ১৮-৬৫ ॥

আমাতে মন সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর।

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্ত্যঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৯-৩২ ॥

হে পার্থ, যাহার পাপ যোনি লাভ করিয়াছে (অস্বর, শ্লেচ্ছ ও যবনাদি), যাহারা স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র তাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ ব্রহ্ম নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া) পরম গতি লাভ করে।

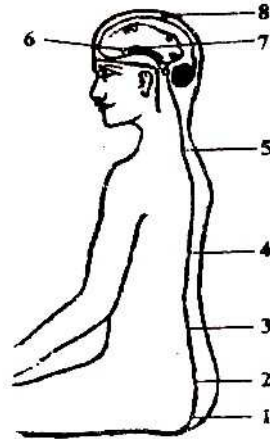
এইরূপ ‘আমি’ শব্দের ব্যবহার কেবলই গীতায়ই হয় নাই; কথোপকথন কালে তন্ত্রাদি বহু শাস্ত্রে শিষ্টকে উপদেশ কালে এইরূপ ‘আমি’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার অর্থ গুরু, আত্মা বা ব্রহ্ম বুঝিয়া লইবে।

অনেক ভাববাদী মহাত্মা ও আধুনিক প্রচারকগণ গীতার উপাস্য তত্ত্বের এই নিগূঢ় নীতিকে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া এবং শক্তিবাদী মহাপুরুষকে নিজেদের মনের মত ভাববাদী কৃষ্ণ সাজাইয়া পৌরোহিত্যবাদীদের কুমতলবের সহায়ক হইয়া হিন্দুর সনাতন উপাসনা বিজ্ঞানকে অত্যন্ত অন্যায়াভাবে বিকৃত করিয়াছেন।

তোমরা যদি জ্ঞান, শক্তি, মেধা, যুক্তিবাদিতা ও শান্তি চাও এবং সর্বোপরি সমাজ জীবনকে আবার গড়িয়া তুলিতে চাও তবে আসল বৈদিক বিধানকে ভিত্তি করিয়া লইবে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে গুরু মানিবার দরুণ (শিগ্গ্বেহং ইত্যাদি। গীতা ২-৭) তিনি অস্মদ্ (আমি) শব্দ প্রয়োগ দ্বারা জটীল দার্শনিক তত্ত্বকে সহজ করিয়াছেন মাত্র। ইহার আসল লক্ষ্য ঐ ব্রহ্ম নাড়ী বা আত্মা।

গীতার একস্থানে বলিয়াছেন - ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব (৭-৭)। সূত্রে যেমন মণি সকল গ্রথিত থাকে ঠিক সেইরূপ আমাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তু ও জীব জড়িত আছে। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য সমস্ত প্রকার জগৎ এবং এই সব জগৎ স্থিত প্রাণীসকল সকলেই ব্রহ্ম নাড়ীতে গ্রথিত আছে। ইহাতে সন্দেহ নাই। গীতায় মৃত্যুকালীন ধ্যান সম্বন্ধে আরও একস্থানে বলিয়াছেন - “অন্তকালেচ মামেব স্মরণুক্তা কলেবরং” (৮-৫) ॥ অর্থাৎ মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যে শরীর ত্যাগ করে ॥ মৃত্যুকালে স্মরণীয় বিষয় যে ব্রহ্মনাড়ী এই শ্লোকে তোমরা সেই কথাই জানিবে। এইরূপ অর্থ করা ভিন্ন বিভিন্ন স্থানের উক্তিতে অসামঞ্জস্য হইবে।

এবার চিত্র দ্বারা ব্রহ্মনাড়ী ও মহা ব্যাহতি বুঝানো যাইতেছি। চিত্র পরিচয় পাঠ কর।



ব্রহ্মনাড়ী চিত্র

এক হইতে পঁচ পর্যন্ত এবং পরে শিব পিণ্ডের উপরিস্থিত নাড়ী অংশ সব মিলাইয়া ব্রহ্মনাড়ী। মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ১০ নং এবং ৮ নং রেখা ব্রহ্ম নাড়ী।

তোমরা জান ‘বৃহৎ মস্তিষ্ক’ মস্তিষ্কের উপরিভাগ ডানে ও বামে দুই টুকরায় অবস্থিত। কাজেই শিব পিণ্ড পর্যন্ত যাইবার পর ব্রহ্মনাড়ী উভয় মস্তিষ্কে দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও ধ্যানকালে দুইভাগে ভাগ করিয়া ধ্যান করিবে না। মস্তিষ্কের উর্দ্ধ অংশে ব্রহ্মনাড়ী দুইভাগে বিভক্ত হইলেও শিবপিণ্ডে কয়েকটি শাখা নাড়ী দ্বারা সংযোগ লাভ করিয়াছে। কাজেই ধ্যানকালে মস্তিষ্কে দুইটা নাড়ী ধ্যান করিতে হয় না। এবার চিত্রের অন্যান্য অংশ দেখ।

- ১ = ভূঃ = মূলাধার।  
 ২ = ভুবঃ = স্বাধিষ্ঠান।  
 ৩ = স্বঃ = মণিপুর।  
 ৪ = মহঃ = অনাহত।  
 ৫ = জনঃ = বিশুদ্ধাখ্য।  
 ৬ = তপঃ = আজ্ঞা। এই কেন্দ্রেই শিব পিণ্ড।  
 ৮ = সত্য = সহস্রার কেন্দ্র।  
 ৭ = গুরুপাদুকা স্থান বা সহস্রার গর্ভস্থান।

গায়ত্রীতে যে ব্যাহতি আছে, উহা ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ।

ভূঃ = ইচ্ছাশক্তি। ১, ২, ৩ কেন্দ্র মিলিয়া ভূঃ।

ভুবঃ = ত্রিণী শক্তি = ৪ কেন্দ্র।

স্বঃ = জ্ঞান শক্তি = বিশুদ্ধাখ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত সমস্ত ব্রহ্মনাড়ী অংশ।

কেহ কেহ উপাসনার মধ্যস্থিত এই সব উন্নত তত্ত্ব বালক বালিকাগণকে না শিখাইবার পক্ষপাতী হইতে পারেন; কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখিবে উপাসনার জ্ঞান একদিনে লাভ হয় না। সমস্ত জীবনের সাধনায় ঐ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। উপাসনার তত্ত্ব বিষয়ক এই সব উন্নত জ্ঞান না জানিলে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কোন কথাই জানা হইল না। এই জন্য উপাসনার শিক্ষা দান ঠিক ঠিক জ্ঞানই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এই জন্য ঋষিগণ ৫ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬ বৎসর পর্যন্ত সময়কে উপনয়ন কাল নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। যাহারা মূর্তি ধ্যানের পক্ষপাতী তাহারা ৪ চিহ্নিত কেন্দ্রে শক্তিমূর্তি বা শক্তিশালী গুরু ধ্যান করিবে।

আমাদের দেশে এখন পৌরোহিত্যবাদিতা, ভাববাদিতা ও বুদ্ধিহীনতা এবং মূর্খতা ধর্মের নামে অনেক কিছু চলিতেছে। কিছু তোমরা এ কথা ভাল ভাবেই জানিয়া রাখিবে- এই যে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্রার পর্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মনাড়ী এবং এই ব্রহ্মনাড়ীর অসংখ্য শাখা নাড়ী, ইহারাই হিন্দুধর্মের একমাত্র ভিত্তি। বৈদিক, তান্ত্রিক, যৌগিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সমস্ত হিন্দু শাখাই এই ব্রহ্মনাড়ী অংশকে কেন্দ্র করিয়া সাধন ভজন করিয়া থাকে। কাজেই তোমরা দেখিতে পাইতেছ সব হিন্দুরাই ব্রহ্মোপাসক এবং সমস্ত প্রকার হিন্দুধর্মের শাখা প্রশাখাতেই 'ব্রহ্মনাড়ী' এবং 'ওঁ' এর ভিত্তি স্প্রতিষ্ঠিত।

মধ্যযুগে বৌদ্ধবাদ বিলুপ্তির পর আমাদের দেশে পৌরোহিত্যবাদ অত্যন্ত প্রবল হয়। তখন সঙ্ঘ্যাবিধি পৌরহিত্যবাদীরা গোপন করিতে চেষ্টা করিয়া সমাজকে উহা হইতে বঞ্চিত করে। তাহার পর 'ভাবুক' মহাত্মারা নানা প্রকারের উপধর্মকে সমাজে প্রচার করিবার দরুণ এই শক্তিশালী উপাসনা অংশ হইতে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

তোমরা বলিতে পার বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ এবং বাংলার বাহিরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তো বৈদিক সংস্কার গ্রহণ করেন এবং বৈদিক উপাসনাও করেন, তবে তাঁহারা কেন নিস্তেজ হইয়া গেলেন ?

উত্তর:- উপনয়নের সাধনাকে আয়ত্ত করিতে হইলে আরও অনেক উন্নত স্তরের যোগবিধান শিক্ষা করিতে হয়। সমাজে সেই সব বিধানের কোন শিক্ষাই দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। বরং যেটুকু সঙ্ক্যোপাসনার কথা আছে উহাও কেহ যথাযথভাবে করেন না।

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ এই বিধানে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এমন কতগুলি হীন এবং অনুদার শিক্ষা পাইয়া থাকে যাহাতে তাহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সব শ্রেণীর মানুষকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা পায়। এই বিদ্রোহবাদিতাই এই সংস্কারের সব লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া ইহাদিগকে নিস্তেজ করিয়া দিতেছে। তোমরা বঙ্গদেশীয় উপনয়ন সংস্কারের সময় উপস্থিত থাকিও এবং কাশীতে সংস্কৃত পাঠশালাগুলিতে বিচরণ করিও। তাহাতে ধর্ম ও সংস্কৃত শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের উৎকৃষ্ট অংশকে (ব্রাহ্মণগণকে) কিভাবে বিদ্রোহবাদী করিয়া গড়িয়া দেওয়া হয় দেখিতে পাইবে।

সন্ধ্যাবেলা তোমরা একটা নৌকাকে তীরে বাঁধিয়া রাখিলে এবং ঐরূপ বদ্ধ অবস্থায়ই সমস্ত রাত্রিতে দাঁড় টানিতে থাকিলে। পর দিন সকালবেলা ঐ নৌকাটা যেখানে বাঁধা ছিল সেই খানেই থাকিবে না কি ? যদি স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা ও বিদ্রোহবাদিতা দ্বারা একজন সাধক নিজেকে আবদ্ধ রাখে তবে ব্রহ্মজ্ঞানের পথে তাহাদের সব সাধনাই ব্যর্থ হইবে না কি ?

তোমরা যদি চণ্ডী পাঠ কর তবে কীলক মন্ত্রে দেখিতে পাইবে - দদাতি প্রতিগৃহাতি নান্যথা সা প্রসীদতি। ইথং রূপেন কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্॥ অর্থাৎ দিবে এবং নিবে, ইহা ভিন্ন তিনি প্রসন্ন হন না। এইরূপ কীলক দ্বারা মহাদেব শক্তিতত্ত্বকে কীল করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ নিজের ক্ষুদ্রতা, অজ্ঞানতা, স্বার্থপরতা, মলিনতাগুলিকে মহাশক্তিতে বিসর্জন দাও এবং মহাশক্তির ব্যাপকত্ব, মহত্ত্ব, জ্ঞান, নির্মলতা, উদারতা ও তেজস্বিতাকে নিজে গ্রহণ কর। এইরূপ বিজ্ঞানে চণ্ডীতত্ত্ব (মহাশক্তি তত্ত্ব) প্রবেশ করিলে তিনি প্রসন্ন হইবেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অনুন্নত, স্ত্রী, যবন প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীতে উন্নত সংস্কার ও বৈদিক উপাসনা বিধানকে ছড়াইয়া দাও। দেখিবে, উচ্চ সভ্যতার সংঘর্ষে ও যুক্তিবাদিতায় আমাদের সমাজজীবন কিরূপ মহান্ ও স্কন্দর হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে। কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের সামঞ্জস্যময় জীবন না হইলে তুমি নিশ্চয়ই নিস্তেজ হইয়া যাইবে। তুমি যদি তেজ অর্জন করিতে চাও তবে সমাজ জীবনকে বিদ্রোহের কোঠায় রাখিয়া মস্ত বড় ‘পণ্ডিতজী’ সাজিলে চলিবে না।

যেখানেই দেখিবে পক্ষপাতিত্ব সেইখানেই উপযুক্তকে বঞ্চিত করা এবং অনুপযুক্তকে উচ্চ প্রতিষ্ঠা দিবার কুবুদ্ধি নিহিত। ইহা আঙ্গরিক নীতির লক্ষণ। আঙ্গরিক নীতি, বর্কর নীতি ও পোরোহিত্য নীতি যে কোন দেশ এবং সমাজের জন্য সর্বনাশের কারণ হইয়া থাকে। বিগত ২৫ বৎসর ধরিয়া খৃষ্টবাদী ইংরেজ আমাদের দেশের এক একটা অত্যন্ত অনুপযুক্ত সম্প্রদায়কে স্বেচ্ছাভোগী করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে বিষাক্ত ও কলুষিত করিতেছে। সহস্র বৎসর ধরিয়া পোরোহিত্যবাদও এইভাবেই আমাদের জাতীয় জীবনের

মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এই জন্ম উপনয়নের মত শক্তিশালী ধর্ম সংস্কার থাকা সত্ত্বেও আমরা নিস্তেজ হইতেছি।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে সব কথাই কিছু কিছু বলা হইল। এবার সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইবে। সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মস্তরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে পাঁচটি স্তর।

## সগুণ ব্রহ্মোপাসনা

গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি ইঁহারা সগুণ ব্রহ্ম। তোমরা যদি পূজাপদ্ধতি পাঠ কর তবে দেখিতে পাইবে এই সগুণ ব্রহ্ম পঞ্চকের পূজা সমস্ত প্রকার পূজার মধ্যে একই রূপে স্থান পাইয়াছে। শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সূর্য্য বা যে কোন দেবতার পূজাই কর না কেন, পঞ্চ দেবতার পূজা তোমাদিগকে করিতেই হইবে। তোমরা গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি মূর্ত্তি দেখিয়াছ। সগুণ ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ পাঁচটি মূর্ত্তি ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা আমাদের পক্ষে জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর বুঝিবার পক্ষে খুবই স্ফবিধা হইয়াছে। অনেক মূর্ত্তের ধারণা যে হিন্দুরা মূর্ত্তিরই পূজা করিয়া থাকে। তোমরা জানিয়া রাখিও, হিন্দুরা ‘আত্মার’ উপাসনা মাত্রই করিয়া থাকে। আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তরই পঞ্চ দেবতা। মূর্ত্তিগুলি কেবল সেই সব স্তরগুলিকে বুঝাইবার সঙ্কেত মাত্র।

তোমরা দেখিতেছ গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এর পর শক্তি রহিয়াছে। অর্থাৎ মনোবিকাশের চারিটা স্তর অতিক্রম করিবার পর শক্তিস্তর পাওয়া যায়। এই শক্তিস্তরই পূর্বোক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার ভিত্তি। শক্তিস্তরে যাইতে হইলে যে সব জ্ঞানের স্তর ভেদ করিতে সেই স্তরগুলিই সগুণ ব্রহ্ম নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিকগণের নিকট এই শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে জানিয়া লইবে। শক্তি ও গতি এক বস্তু।

মনোবিকাশের এই সব স্তরগুলি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা একটু স্পষ্ট করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইতিপূর্ব ব্রহ্মনাড়ীর কথা তোমরা জানিয়াছ। ঐ ব্রহ্মনাড়ী ভিন্ন আরও অসংখ্য নাড়ী আমাদের মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে বিদ্যমান। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে এবং মেরুদণ্ডের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি মর্মানস্থান আছে। ঐ সব মর্মানস্থান ও মর্মান্বেত্র সংযোগকারী বহু তার আছে। এই তারগুলিকে নাড়ী বলে। এবং ঐ মর্মান্বেত্রগুলিকে ষট্ চক্র বলে। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব কেন্দ্র মস্তিষ্কে এবং মেরুদণ্ডে উভয় স্থানে বিদ্যমান। মস্তিষ্কের গণেশের সহিত মেরুদণ্ডের গণেশ এবং বিষ্ণুর সহিত মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত বিষ্ণুর সংযোগ আছে। এইরূপ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডগত স্বজাতীয় কেন্দ্রগুলি ও উহাদিগের সংযোগকারী তারগুলি এক স্তরের অনুভূতিতে স্পন্দিত বা জিয়াশীল হয়। মনে কর গণেশ স্তরের অনুভূতি ফুটিল; সেই সময় দুইটি গণেশ কেন্দ্র এবং উহাদের সংযোগকারী নাড়ী স্পন্দিত হইতে থাকিবে। সগুণব্রহ্মের অনুভূতিগুলি এবং সেই সব অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এইরূপ মহাত্মার বিশেষ লক্ষণই গণেশ, সূর্য্যাদি ধ্যানগুলিতে বিদ্যমান। তোমরা “ক্রমবিকাশবাদ” আলোচনা করিয়া সব কথাই জানিতে পারিবে।

গণেশ - বুদ্ধি, বিবেক, বিচার প্রভৃতির সমষ্টিই গণেশ। আমাদের মস্তিষ্কের কপালের দিকে গণেশ কেন্দ্র বিদ্যমান। এই বুদ্ধির মেরুদণ্ড কেন্দ্র হৃদয়ে অর্থাৎ অনাহতে অবস্থিত। ব্রহ্মনাড়ী পরিচয় চিত্রে ৪ কেন্দ্র। মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৭ নং কেন্দ্র গণেশ। যোগ শাস্ত্রে ইহাকে ক্রমমধ্য স্থান বলে।

সূর্য্য - স্নেহ, ভালবাসা ও প্রেমই সূর্য্য। এই কেন্দ্র মস্তিষ্কের পেছনের দিকে অবস্থিত। এই কেন্দ্রে লীলা স্মৃতি অবস্থান করে। ইহারও মেরুদণ্ড শাখা অনাহতে বিদ্যমান (ব্রহ্মনাড়ী পরিচয় চিত্রে ৪ কেন্দ্র)। মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ২ নং কেন্দ্র 'সূর্য্য'।

বিষ্ণু - সমাজ প্রেমই বিষ্ণু। ইহার কেন্দ্র মস্তিষ্কের পেছনের দিকে বিদ্যমান। আমরা যে স্থানে শিখা রাখি সেই স্থানের সমসূত্র স্থানে মস্তিষ্কের মধ্যে এই কেন্দ্র অবস্থিত। এখানেও আমাদের স্মৃতি ও কর্মফল জমা থাকে। তবে এখানে স্মৃতির সূক্ষ্ম অংশ জমা থাকে। ইহাকে স্মৃতিস্থিতি বলা যায়। নিদ্রাকালে জীবমাত্র এই কেন্দ্রে বিশ্রাম লয়। কিন্তু স্বপ্ন কালে জীবের স্থিতি সূর্য্য কেন্দ্রে হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডের মধ্যে অনাহতে ইহার কেন্দ্র বিদ্যমান। মস্তিষ্কের বিষ্ণু কেন্দ্র মস্তিষ্ক পরিচয় চিত্রে ৩ নং কেন্দ্রকে জানিবে।

শিব - শান্তিই শিব। মস্তিষ্কে দুইটি শিব কেন্দ্র বিদ্যমান। উহার একটি শান্তি প্রধান শিবকেন্দ্র এবং অন্যটি জ্ঞান প্রধান শিবকেন্দ্র। মেরুদণ্ডগত শিব কেন্দ্র বিশুদ্ধাখ্য এবং স্বাধিষ্ঠানে বিদ্যমান। মস্তিষ্ককেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৪ = শান্তি প্রধান শিব। ৫ = জ্ঞান প্রধান শিব। ব্রহ্মনাড়ীর পরিচয় চিত্রে ৫ = বিশুদ্ধাখ্য এবং ২ = স্বাধিষ্ঠান। এই কেন্দ্র হইতে সর্বদা একটা শান্তি রস স্রাব হয়। বেদে এই রসকে সোমরস বলে। ইহা দ্বারা আমাদের মন স্নিগ্ধ থাকে। এই স্রাবকে কোন কোন শাস্ত্রে গঙ্গার ধারা বলিয়াছে। এখান হইতে এই স্রাব মেরুদণ্ড মধ্যগত নাড়ী মণ্ডলকে স্নিগ্ধ করিয়া সমস্ত শরীরকে স্নিগ্ধ ও নিরোগ করে। পূর্ব নির্দিষ্ট উপাসনা করিও। এই স্রাবধারা তোমাদিগকে নিরোগ করিতে সাহায্য করিবে।

শক্তি - মানুষের ঈশ্বরত্বই 'শক্তি'। রাজশাসনের নীতি ও রাজপালনের নীতিকে - আঙ্গরিকতা, বর্করতা, শোষণ ও গুণ্ডামী ভাঙ্গিয়া দিয়া সমাজকে স্বথী ও বিকাশানুকূল রাখার যে শক্তি উহাই ঈশ্বরত্ব। আঙ্গরিকতার বিরুদ্ধ শক্তিই ঈশ্বরত্ব। মস্তিষ্কের সবগুলি কেন্দ্র এবং মেরুদণ্ডমধ্যগত সবগুলি মর্মস্থান একটি নাড়ীর আশ্রয়ে অবস্থান করে এই নাড়ীই শক্তিনাড়ী। ইহাকে আমরা ব্রহ্মনাড়ী বলিয়াছি। মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ১০ চিহ্নিত ও ৮ চিহ্নিত নাড়ীই শক্তি বা ব্রহ্মনাড়ী। সঙ্কেতপাসনার ক্রমধারায় ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণীর কথা তোমাদের মনে আছে। এইভাবে তিনটি সঙ্কেতপাসনা করিয়া আমরা তুরীয়া সঙ্কেত উপাসনার ব্রতী হই। এই দিকেও আমরা ক্রম উপাসনায় শিব স্তর ভেদ করিলে ঐ তুরীয় শক্তিই পাইয়া থাকি। দুইটি লক্ষ্য একই, তবে একটিতে প্রাকৃতিক নিয়মকে বা সময় প্রকৃতিকে ভিত্তি করিয়া উপাসনা করা হয়, অন্যটিতে মনের বিকাশ ক্রমকে অতিক্রম করিয়া শক্তিস্তরে অগ্রসর হইতে হয়। ব্রহ্মাণী ও সূর্য্য, বৈষ্ণবী ও বিষ্ণু এবং রুদ্রাণী ও শিবস্তর প্রায় একপ্রকার তত্ত্ব। ইহাদের মধ্যে যে সামান্য ভেদ আছে উহা তোমাদের পক্ষে বুঝিতে জটিল হইবে তবুও এসম্বন্ধে বলা যাইতেছে - আমরা যতক্ষণ জীবাত্মবোধে বদ্ধ থাকি ততক্ষণ শক্তি বা ব্রহ্মতত্ত্ব ঠিক ঠিক বুঝিতে অক্ষম। শিবস্তর

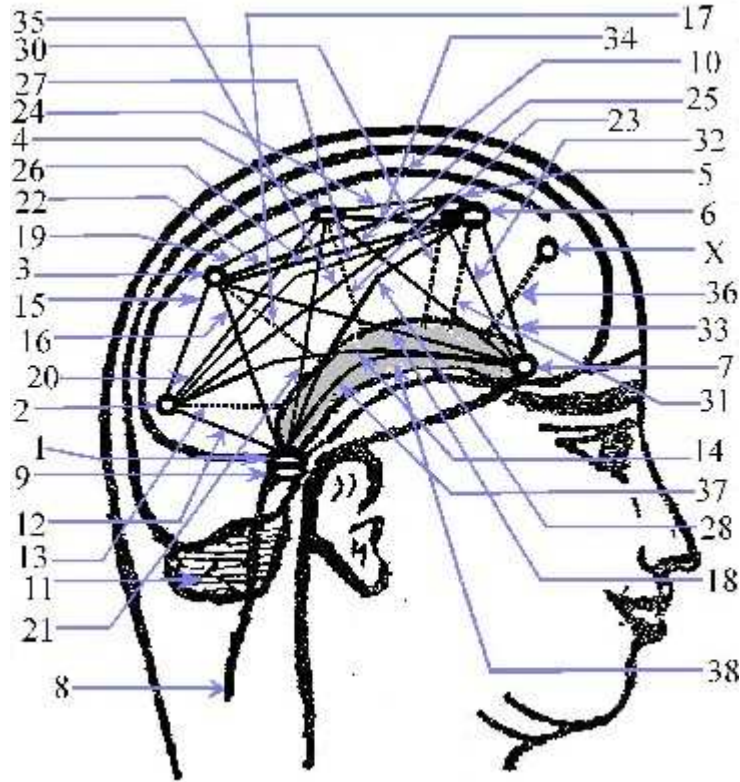
ভেদ হইবার পর আমাদের জীবাঙ্গবোধ শেষ হয় তখনই ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী প্রভৃতি শক্তিজ্ঞান আমরা অনুভব করিতে সক্ষম। জীবাঙ্গবোধ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণুস্তর অনুভব করা যায়। কিন্তু ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী শক্তিকে ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী শক্তির আভাষ মাত্র সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিবস্তরে বিদ্যমান। বিস্তারিত ক্রমবিকাশ ৭ম অধ্যায়ে দেখ।

গণেশ = বিবেক, ত্যাগ ও সংযমের সমষ্টি।

শিব = মনের শান্তি, তপস্যা, ও বিষয়ে অত্যন্ত নিবৃত্তি।

গণেশ এবং শিবজ্ঞান সিদ্ধ হইলে বিকাশ তুরীয় স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমাদের মনোবিকাশের ক্রমগুলির নাম পঞ্চ দেবতা বা পাঁচটি সগুণ ব্রহ্ম। এবং বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মগুলির নাম ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী ও তুরীয়া। আমরা জীবত্বের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শিবত্ব লাভ করিলেই শক্তিতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারি।

শিক্ষক এবং বিদ্যার্থীগণ হিন্দুধর্মের মধ্যে অত্যন্ত দার্শনিকতা ও বিজ্ঞান সম্পদ দেখিয়া ভয় পাইবেন না। হিন্দুধর্ম সস্তায় বিশ্বাসবাদের ধর্ম নহে। ধৈর্য্য ধরিয়া আলোচনা করুন। ক্রমে সবই সহজ হইয়া উঠিবে।



(মস্তিষ্ক কেন্দ্র চিত্র)

১। মনের কেন্দ্র।

২। সূর্য্য কেন্দ্র।

- ৩। বিষ্ণু কেন্দ্র।
- ৪। শিব কেন্দ্র।
- ৫। উন্নত শিব কেন্দ্র।
- ৬। গণেশ কেন্দ্র।
- ৭। মেরুদণ্ডগত ব্রহ্মনাড়ী বা শক্তিনাড়ী।
- ৮। মস্তিস্কস্থিত ব্রহ্মনাড়ী বা শক্তিনাড়ী।
- ১০। ছোট মস্তিস্ক বা প্রাণ মস্তিস্ক।
- ৩৮। শিব পিণ্ড।

সগুণ ব্রহ্মস্বরের সবগুলি অনুভূতিই ব্যাপক। যুগপৎ এতগুলি অনুভূতি ব্যাপক কি ভাবে হইতে পারে সে সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এক চৌবাচ্চায় জল রহিয়াছে। তাতে লাল রং মিলাইয়া দাও। উহাতে কিছু লবণ মিলাও। উহাতে চিনি গুলিয়া দাও। এবার চৌবাচ্চার জলগুলি আলোড়ন করিয়া লও। এখন চৌবাচ্চার দিকে তাকাও। একজন বলিল, চৌবাচ্চায় জল ব্যাপকভাবে অবস্থান করিতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, চৌবাচ্চায় লাল রং ব্যাপ্ত আছে। একজন একটু পান করিয়া বলিল, এতে নুন ব্যাপক ভাবে বিরাজমান। অন্য জন পান করিয়া বলিল, এতে চিনি ব্যাপ্ত আছে। তোমরা দেখিতেছ কেহই মিথ্যা বলে নাই। এখন তুমি যদি প্রত্যেকটী জল কণা বিশ্লেষণ কর তবে দেখিতে পাইবে, জল কণাগুলিতে এমন সব ফাঁক আছে যাহাতে লাল রং, নুন, ও চিনি কণাগুলি স্থান পাইয়া আছে। ঠিক এইরূপ সগুণ ব্রহ্মের অনুভূতিগুলি প্রথম প্রথম সাধকের নিকট ব্যাপক মনে হয় কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে অনুভূতিগুলির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক আছে। ক্রমে সেগুলি ধরা পড়ে এবং অন্য স্বরের অনুভূতি আসিবার পথ হয়। নির্গুণ ব্রহ্মস্বরের অনুভূতিতে ফাঁক থাকে না।

## মূর্তি বিজ্ঞান

(নারায়ণ শিলা ও শিবমূর্তি)

আমাদের ধর্ম শালগ্রাম নারায়ণ ও শিবমূর্তি নামক দুইটী বিচিত্র মূর্তি আছে। এই দুইটী মূর্তি যে কি ইহা তোমাদের নিকট স্পষ্ট করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কারণ মূর্তি সম্বন্ধে বিগত ২০০০ বৎসর ধরিয়৷ নানা প্রকার মিথ্যা কথা প্রচারের চেষ্টা চলিতেছে। বাইবেল এবং কুরান মূর্তি সম্বন্ধে অকারণ মিথ্যা প্রচার করিয়াছে। আবার আমাদের দেশের পৌরোহিত্যবাদীরা মূর্তির সমর্থক হইলেও অব্রাহ্মণকে ধর্মতত্ত্ব গোপন করিবার জন্য পুরাণাদি শাস্ত্রে বহু মিথ্যা কথা কল্পনা করিয়া লিখিয়াছে। আমাদের ধর্ম শিবমূর্তি সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তি। এই মূর্তির সহিত যোগবিদ্যার বিশেষ সম্বন্ধ থাকিবার দরুণ এবং যোগ রহস্য অব্রাহ্মণগণের নিকট গোপন করিবার জন্য পৌরোহিত্যবাদীরা শিবপূজা সম্বন্ধে

অনেক মিথ্যা কথা পুরাণে লিখিয়াছে। ইহার ফলে আজ এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে ব্রাহ্মণ সন্তানগণও শিবমূর্তি বিজ্ঞান সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া গিয়াছে।

খুব লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ শিলা দেখিলে দেখিতে পাইবে উহার মধ্যে একটা ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রের মধ্যে উপরে ও নীচে স্কন্দের ছত্রাকার চক্র আছে। ঐ চক্র দুইটির কেন্দ্র একই বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। যদি তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হও তবে বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদকালে ঐ চক্রের মত একটা স্তরের অনুভূতি লাভ হইবে। অনুভূতিতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় - নিজের আত্মসত্ত্বা একটা বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত আছে। সেই বিন্দুর উপরে ও নীচে গলিত সোনার মত রং বিশিষ্ট দুইটা আকাশ ঐ বিন্দুরূপে কেন্দ্রীভূত আমিত্বটীকে যেন চাপিয়া রাখিয়াছে।

এই অনুভূতিকালে আর কোন কথাই মনে থাকিবে না। ইহা একটা স্তরের সমাধির অনুভূতি। আমরা খুব গভীর নিদ্রায় এই বিষ্ণুস্তরের স্বেদে ডুবিয়া থাকি। নিদ্রাকে তামস সমাধি বলা চলে। যাহা হউক নারায়ণ শিলাতে এই সমাধির রহস্য আছে বলিয়া নারায়ণ শিলাতে বিষ্ণু পূজার বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে।

নারায়ণ শিলা, শিবলিঙ্গ, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তিমূর্তি সবই ব্রহ্মতত্ত্বকে বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন স্তরের যজ্ঞ মূর্তি। এই সব মূর্তিতে যে কোন দেবতার পূজা করা চলে। পূজাবিধান আজকাল এক শ্রেণীর বংশগত ব্যবসায়ের পরিণত হইবার দরুণ পূজাতত্ত্ব হইতে সমাজ দিন দিন দূরে সরিয়া যাইতেছে।

এই দিকে ভাববাদীরা পূজার অনুষ্ঠান অংশ ত্যাগ করিয়া মূর্তিকে সাজানো গোছানো অনুষ্ঠানকেই পূজা বলিয়া মনে করিতেছে। তোমরা জানিয়া রাখিবে পূজা অনুষ্ঠান অত্যন্ত স্কন্দর, আনন্দ ও উৎসাহপ্রদ যোগ বিদ্যার অনুষ্ঠান। এই উপাসনা কাণ্ডকে পুরোহিতের হাতে সমর্পণ করা বা শুধু সাজাইয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করার অর্থ হইতেছে নিজেরা এইরূপ আনন্দপ্রদ অনুষ্ঠান হইতে বঞ্চিত থাকা ও মূর্খতা করা। সঙ্ক্যানুষ্ঠান যেমন নিজেদের অবশ্য কর্তব্য, ঠিক সেইরূপ নৈমিত্তিক উপাসনাও নিজেদেরই কর্তব্য। কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ দশবিধ সংস্কার (বিবাহ আদি) ব্যাপারে পুরোহিত নিয়োগ করা চলে, কিন্তু কোন প্রকার উপাসনা কাণ্ডেই পুরোহিত নিয়োগ আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। বঙ্গদেশে ছাত্রগণ কত আনন্দ করিয়া সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আমরা ছাত্রগণকে সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান নিজদিগকে করিতে বলিতেছি। পূজক, তন্ত্রধারক, সদস্য, নিরীক্ষক প্রভৃতির সমষ্টিতে এক পূজা সভা নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত করিয়া লইয়া একাজ সম্পন্ন করিতে বলিতেছি। দেখিতে পাইবে ইহা অতীব আনন্দপ্রদ অনুষ্ঠান। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেখিতে পাইবে পুরোহিতরা কিরূপ ফাঁকী পূজার অনুষ্ঠান করিয়া পয়সা ও পাপ অর্জন করিয়া থাকে। যাহাতে খুব স্কন্দরভাবে এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে পূজা অনুষ্ঠান হইতে পারে এইজন্য আমরা সরস্বতী, দুর্গা, লক্ষী ও কালী পূজার বই লিখিবার কথা ভাবিতেছি।

নারায়ণ শিলা যে বিষ্ণুস্তরের অনুভূতির রহস্যপূর্ণ মূর্তি একথা তোমরা জানিলে। তোমরা ইতিপূর্বে জানিয়াছ যে সমাজপ্রেমই বিষ্ণু। নারায়ণ শিলাতে সমাজ প্রেমের আদর্শও বিদ্যমান। শিলার মধ্যস্থিত সেই আত্মবিন্দুই নেতা। ঐ বিন্দুর উপরিস্থিত চক্রই যোগী ও জ্ঞানীদের সমষ্টি। নিম্নস্থিত চক্রটী সর্বসাধারণের সমষ্টি জানিবে। অর্থাৎ তুমি

যদি সমাজকে সেবা করিতে চাও তবে তুমি নিজে যথেষ্ট উচ্চ স্তরের জ্ঞান আয়ত্ত করিবে এবং যোগী, ত্যাগী ও মহাত্মাগণের জ্ঞানশক্তি সর্বদা আকর্ষণ করিবে এবং সর্বসাধারণকে সংঘবদ্ধ রাখিয়া নিজের মধ্যস্থিত কর্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তিতে সমস্ত সমাজকে শক্তিশালী রাখিবে। সমাজ সেবার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তোমরা রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, রাজাগণ এইভাবেই ঋষিগণের উপদেশ গ্রহণ করিতেন এবং সর্বসাধারণকে ঐ ভাবেই রক্ষা ও পালন করিতেন। যেখানে দেখিতে পাইবে রাজা বা নেতা জ্ঞান, যুক্তিবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতাকে উপেক্ষা করিতেছেন বা জ্ঞানী, যুক্তিবাদী বা ন্যায়পরায়ণগণের পরামর্শ উপেক্ষা করিতেছেন, সেইখানেই নেতা অত্যন্ত দাম্ভিক হইয়াছেন বুঝিতে হইবে। যুক্তিবাদিতার অবমাননা নেতা বা রাজার দুর্বলতা বা দাম্ভিকতার লক্ষণ। ইহা সমাজ জীবনের বিপদ সূচক। হিন্দুদের সাংসারিক বা সামাজিক জীবনের সমস্ত প্রকার অনুষ্ঠানেই নারায়ণ পূজার ব্যবস্থা আছে। ইহার কারণ সমাজ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নারায়ণ মূর্তিতে বিদ্যমান। নারায়ণ মূর্তির মর্মকথা হইতে সর্বসাধারণকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে এই শিলাতে ছুঁৎমার্গ ফলানো হইয়াছে। পুরোহিতের স্ত্রী পর্যন্ত এই শিলা স্পর্শ করিলে শিলাবাবার জাত যায়। শিলাবাবা নিশ্চয়ই এতটা ব্রহ্মচারী নহেন যে নারী তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা ভালভাবেই জানি ‘নারায়ণের’ সাথী লক্ষ্মী ও তুলসী সদাই বিদ্যমান। পশ্চিম দেশে চামাররাও পুরোহিতের নির্দেশে নারায়ণ পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু বাংলার এই ছুঁৎমার্গ অনেকটা গভীর। বাংলায় পৌরোহিত্যবাদের বাড়াবাড়িটা একটু বেশী। বিষ্ণুচালের মায়ের মূর্তিও সব জাতের লোকেই স্পর্শ করে। কিন্তু বাংলার সর্বত্র ছুঁৎমার্গ ও দক্ষিণা বা দর্শনীর প্রাচুর্য্য।

এবার শিবমূর্তি সম্বন্ধে বলা যাইতেছি। তোমরা শিবের মূর্তি দেখিয়াছ। একটি অণ্ডাকার পিণ্ড মূর্তি, একটি পীনেট ও একটি ফণীধর মিশ্রণে এই মূর্তি গঠিত। এই অণ্ডাকার পিণ্ড, পীনেট ও ফণীধর বুঝিতে পারিলে শিবমূর্তির রহস্য বুঝিতে পারিবে।

তোমরা শরীর যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানিতে পারিবে - আমাদের মাথায় অস্থিময় আবরণের মধ্যে দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ক ও দুইটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আছে। বৃহৎ মস্তিষ্ক দুইটী মাথার উপরিভাগে এবং ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দুইটী মাথার পেছন দিকে অবস্থিত।

যখন যোগশাস্ত্র পাঠ করিবে তখন দেখিতে পাইবে - মেরুদণ্ডের মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য নামক ৫টী চক্রস্থান বিদ্যমান। এবং মস্তিষ্কে আজ্ঞা ও সহস্রার নামক দুইটী মর্মস্থান বা চক্রস্থান বিদ্যমান। এই সব মর্ম কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা যদি তোমরা জানিতে চাও তবে ক্রমবিকাশ অষ্টম অধ্যায়ে দেখিবে। আমাদের পূর্ব যুগের যোগীরা এই সব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এ সব মর্মস্থানের প্রত্যেকটী শাখাতে কিরূপ মনস্তত্ত্ব বিদ্যমান সেই সম্বন্ধে তন্ত্র শাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া এই সব কেন্দ্রগুলিতে ষট্ চক্রের চিত্রের মত খঁজিতে চেষ্টা করিয়া মূর্খতার চরম নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। চক্রকেন্দ্রগুলিকে ধ্যান করিবার কৌশল এবং মর্মকেন্দ্রগুলির বাস্তব স্থিতি একরূপ নহে। অনাহতে ১২টী শাখা বিশিষ্ট একটি মর্মকেন্দ্র আছে। শব ব্যবচ্ছেদ দ্বারা ঐরূপ ১২টী শাখা বিশিষ্ট মর্ম নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া উহা যে ১২টী দল বিশিষ্ট

অন্যহত পদ্মটির মতন আকার বিশিষ্ট হইবে ইহা মনে করা ভুল। প্রত্যেকের জানা প্রয়োজন ধ্যান করিবার সঙ্গে মনস্তত্ত্বের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। ধ্যান কেবল মর্মানস্থানের স্থূল জ্ঞান লাভ করিবার জন্য নহে। উহাতে মনকে একাগ্র ও সমাহিত করিবার বিজ্ঞানও জড়িত। কাজেই মর্মান্বেশের ধ্যানবিজ্ঞান ও বাস্তব স্থিতিতে ভেদ থাকিবেই। শিব যোগবিদ্যার দেবতা, ইহা হয় তো তোমরা জান। মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রান্ত মূলাধার পর্যন্ত বিস্তৃত এই যে আত্মজগৎ ইহাই শিব। তোমরা যে শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাও উহা এই আত্মজগতেরই মূর্ত্তি।

মস্তিষ্কের উপরি ভাগস্থিত বৃহৎ মস্তিষ্ক দুইটি একটি মর্মানস্থান দ্বারা সংযুক্ত। এই সংযোগকারী মর্মানস্থান শিবপিণ্ড। এই শিব পিণ্ডের পেছন দিকে ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কেন্দ্র বিদ্যমান। এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কেন্দ্র এবং স্ক্রমুল্লার শীর্ষস্থান প্রায় একই স্থানে আসিয়া মিশিয়াছে। মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডের সামনের দিকে (ক্রমধ্য স্থানে) বুদ্ধি কেন্দ্র অবস্থিত। এই শিবপিণ্ডের পেছন দিকে মন কেন্দ্র ও প্রাণ কেন্দ্র অবস্থিত। (মস্তিষ্ক কেন্দ্র চিত্রে (১) = মন, (৯) = প্রাণ, (৭) = বুদ্ধি)। শিবপিণ্ডের উপরি ভাগকে (যোগ শাস্ত্র নির্দিষ্ট) গুরু পাদুকা বলে। ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দুইটিকে তোমরা প্রাণ মস্তিষ্ক জানিবে। ইহারা প্রাণকেন্দ্রের কাজের জন্য শক্তিদান করে। প্রাণকেন্দ্রই স্ক্রমুল্লা শীর্ষ ও প্রাণমস্তিষ্ককে চালাইয়া থাকে।

যোগশাস্ত্র নির্দিষ্ট দ্বিদলই (আজ্ঞা চক্র) বৃহৎ মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগ। এই শিবপিণ্ডই ঐ দ্বিদলের কর্ণিকা বা মধ্যস্থান। এই বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরি ভাগই সহস্রার। অনেক অনভিজ্ঞকে ছোট মস্তিষ্ক দুইটিকে দ্বিদল বা আজ্ঞাচক্র এবং বৃহৎ মস্তিষ্ক দুইটিকে সহস্রার বলিতে শুনা গিয়াছে। তোমরা অনভিজ্ঞদের কথায় বিভ্রান্ত হইবে না। এই শিবপিণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া যোগবিদ্যার সমস্ত সাধন ক্রিয়া বিজড়িত রহিয়াছে। ইহাতে ভুল করিলে সমস্ত উপাসনাই পণ্ড হইবে। চিত্রদ্বারা এই সব কথা আরও স্পষ্ট করা হইবে। কারণ হিন্দুধর্মে ইহা খুব মূল্যবান কথা। এই শিবপিণ্ডে আমাদের শরীরস্থিত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যন্ত্রপরিচালক কেন্দ্র বিদ্যমান। এই শিবপিণ্ড ধ্যান করিলে সমস্ত শরীরস্থিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্র নীরোগ থাকে।

বৃহৎ মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগই আজ্ঞা এবং বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরি ভাগই সহস্রার। বৃহৎ মস্তিষ্ক দুইটির সংযোগ স্থূলই শিবপিণ্ড। এই শিবপিণ্ড হইতে মস্তিষ্কের এক শাখা অংশ মেরুদণ্ডের মধ্যভাগ ধরিয়া মূলাধার পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। ব্রহ্মনাড়ীর উর্দ্ধভাগ এবং সহস্রার শিবমূর্ত্তিস্থিত সর্পের ফণাভাগ এবং ব্রহ্মনাড়ীর নিম্ন ভাগ ও মেরুদণ্ডস্থিত ৫টি মর্মান্বেশই শিবমূর্ত্তির সর্পপুচ্ছ। তোমরা চিত্র দেখিয়া সব বুঝিয়া লইবে।

শিবমূর্ত্তি, আজ্ঞাচক্র ও সহস্রার এবং মস্তিষ্ক একই বস্তু। শিবমূর্ত্তির পিণ্ডস্থান = আজ্ঞা চক্রের মধ্যস্থান = বৃহৎ মস্তিষ্ক দুইটির সংযোগ স্থান।

শিবমূর্ত্তির পীনেট = আজ্ঞা চক্রের দুইটি দল = বৃহৎ মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগ।

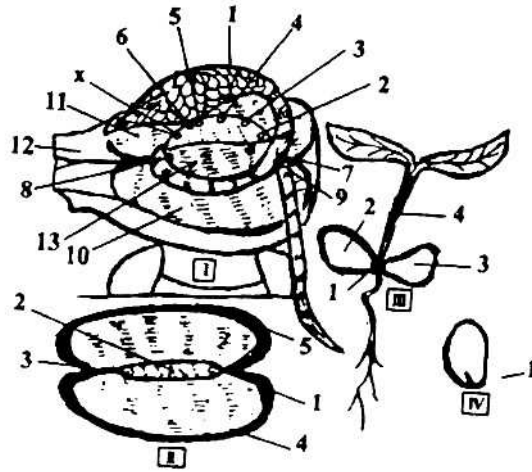
শিবমূর্ত্তির সর্পফণা = সহস্রার = বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরি ভাগ। এখানেই ব্রহ্মনাড়ীর উপরের অংশ আছে।

শিবমূর্তির সর্পের লেজ = স্ক্রুল্লার শীর্ষ ও মেরুদণ্ডস্থিত ব্রহ্মনাড়ী ও সমস্ত মেরুমজ্জা অংশ।

ইতিপূর্বে তোমাদিগকে ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানসহ উপাসনা করিতে বলা হইয়াছিল। তোমরা যদি শিবপিণ্ড সহ ব্রহ্মনাড়ী ধ্যান করিয়া উপাসনা কর তবে তোমরা বেশী লাভবান হইবে। ইহা দ্বারা শান্তি, জ্ঞান এবং তেজস্বিতা সবই সহজ হইবে কিন্তু শুধু ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানে তেজস্বিতা বৃদ্ধি হয় জানিবে।

শিবের পীনেটটি সব সময় দিক্‌যন্ত্রের মত উত্তর দিকে থাকে। শিবপূজা উত্তর দিকে মুখ করিয়া করিতে হয়। পৃথিবীর উত্তর দিকে ধ্রুব নক্ষত্র অবস্থিত। ইহাই সত্যস্থান বা ধ্রুবস্থান। মস্তিষ্কস্থিত বুদ্ধিকেন্দ্রের (ক্রমধ্য স্থান) সহিত পৃথিবীর উত্তর মুখে একটা চুম্বক ক্রিয়া চলিতেছে। ঐ ক্রিয়ার সহিত আমাদের মন ও বুদ্ধিকেন্দ্রসংযুক্ত ক্রিয়া একরূপতা লাভ করিলে আমাদের জ্ঞান সৃষ্টি রহস্য জানিবার পক্ষে শক্তিশালী হয়। পৃথিবী ও ধ্রুব সংযোগকারী চুম্বক ক্রিয়া এবং মন ও বুদ্ধি সংযুক্ত শক্তি ক্রিয়া এক রেখায় আনিবার জন্য উত্তর মুখে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয়।

শিবমূর্তি সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করা হইয়া থাকে। তোমরা শিবমূর্তি সম্বন্ধে আসল কথা সবই জানিলে। এই মূর্তি জীবের আত্ম মূর্তি। বৃক্ষ, কৃমি, পাখী, পশু ও মানবে এই শিবমূর্তি আত্ম মূর্তিরূপে অবস্থিত। সমস্ত প্রকার মল্ল উপাসনার লক্ষ্য এই শিবমূর্তি ; তোমরা “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি” মন্ত্রের নাম শুনিয়াছ। এই মন্ত্রের লক্ষ্যও এই শিবমূর্তি। বিস্তারিত রাখা তল্পে দেখ। পৌরোহিত্যবাদী ও ভাববাদীরা অকারণ এই জ্ঞান ও শক্তি মূলক উপাসনা লক্ষ্যকে বিকৃত করিয়া সমাজ জীবনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এই মূর্তি ধ্যান অতীব সহজ ও স্কন্দর। এজন্য যোগাভ্যাস কালে এই শিবমূর্তিকে শিবপিণ্ডে বা যে কোন চক্রে মনকে একাগ্র করিবার জন্য ধ্যান করিবার বিধান আছে। তোমরা শিব পূজা করিয়া দেখিও - মনে কিরূপ শান্তি পাওয়া যায়।



শিবমূর্তি, আজ্ঞা, বীজ ও অঙ্কুর চিত্র

এবার চিত্রদ্বারা শিবমূর্ত্তি বুঝানো যাইতেছে। I এই চিত্রটি শিবমূর্ত্তি চিত্র।

১। সর্প ফণায় সহস্রার কেন্দ্র। ২, ৩, ৪, ৫, ৬, X এই সব শিবপিণ্ড স্থানে ৬ টি গুরু পাদুকা কেন্দ্র। এই পুস্তকে এই সব কেন্দ্র সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা হইবে না। শিবপিণ্ডের উর্দ্ধ অংশই গুরু পাদুকা।

৭। মনের কেন্দ্র।

৮। বুদ্ধি কেন্দ্র।

৯। প্রাণের কেন্দ্র।

১০। আজ্ঞা চক্রের বামদিকের পত্র। ইহা পীনেটের পশ্চিমার্দ্ধ।

১১। পীনেটের পূর্বার্দ্ধ। ইহাই আজ্ঞা চক্রের দক্ষিণ পত্র।

১২। পীনেটের উত্তর দিকের পুচ্ছ।

১৩। শিবপিণ্ডের নিম্ন অংশ বা আজ্ঞা অংশ। ইহাই আজ্ঞাচক্রের কর্ণিকা। শিবপিণ্ডের উর্দ্ধ অংশই গুরুপাদুকা।

II ইহা একটি আজ্ঞা-চক্র চিত্র।

১। মনের কেন্দ্র।

২। আজ্ঞাচক্রের কর্ণিকা। ইহাই শিবপিণ্ডের আজ্ঞাঅংশ।

৩। বুদ্ধি কেন্দ্র।

৪। আজ্ঞাচক্রের বাম পত্র।

৫। আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণ পত্র।

III ইহা একটি অক্ষুর চিত্র। বীজ পুঁতিলে প্রথমটায় এইরূপ চারা উদ্গত হয়।

(১) চারার মূল ভাগ, উর্দ্ধ ভাগ এবং বীজের দ্বিদল সংযোগ স্থূল। এই চিত্রের সহিত শিবমূর্ত্তিটির তুলনা কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে শিবমূর্ত্তি কেবল আমাদের আত্মমূর্ত্তি নহে। ইহা বৃক্ষাদিরও আত্মমূর্ত্তি। এই স্থানেই বৃক্ষের প্রাণকেন্দ্র বিদ্যমান। আমাদের প্রাণও ৯ (I চিত্র) চিহ্নিত স্থানে আছে।

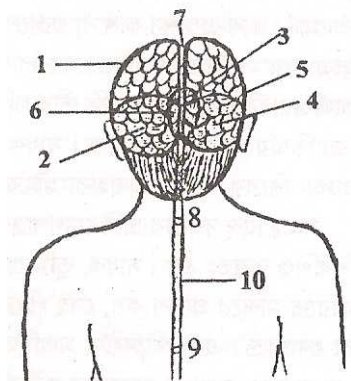
২,৩ চারার এই দুইটি অংশের সহিত আজ্ঞাচিত্রের ৪, ৫ অংশ এবং শিবমূর্ত্তির ১০, ১১ অংশ মিলাও।

৪ চিত্রের এই অংশ এবং চারার মূলভাগই শিব মূর্ত্তিতে সর্প।

IV ইহা বীজ চিত্র। এইরূপ বীজ মাটি ও জলের আশ্রয় পাইলে III চিত্রের মত চারা বাহির হয়।

১ বীজে ইহাই অক্ষুর। এই অক্ষুরই ওঁ কার। ওঁ কার = ব্রহ্মনাড়ী = ওঁ = ব্যাহতি = শিবমূর্ত্তির সর্প = আত্মা।

এখানে আরও একটি চিত্র দ্বারা মস্তিস্কে সহস্রার আজ্ঞা ও শিবপিণ্ড বুঝান যাইতেছে।



মস্তিষ্কে আজ্ঞা, সহস্রার ও শিবপিণ্ড চিত্র

### চিত্র পরিচয়

১। বাম মস্তিষ্কে সহস্রার।

৫। দক্ষিণ মস্তিষ্কে সহস্রার। মস্তিষ্কের উপরি ভাগই সহস্রার। পাগড়ীর আকারে সহস্রার অংশ দেখানো হইয়াছে।

২। বাম মস্তিষ্কে আজ্ঞার বাম পত্র। বৃহৎ মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগই আজ্ঞা। আড়াআড়িভাবে অঙ্কিত রেখা দ্বারা সহস্রার-এর নিম্ন অংশে ইহার অবস্থান দেখানো হইয়াছে।

৪। দক্ষিণ মস্তিষ্কের আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণ পত্র।

৬। ৩। উভয় মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত সহস্রার গর্ভস্থিত এবং আজ্ঞা মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড। ৩ শিবপিণ্ডে গুরুপাদুকা। ৬ চক্রের ওঁ বা শিবপিণ্ডে আজ্ঞা অংশ। ছোট ছোট দাঁড়া রেখা দ্বারা সহস্রার এর গর্ভে এই শিবপিণ্ড অংশ দেখানো হইয়াছে।

৭। দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত ফাঁকা স্থান। এই ফাঁকা স্থানটি শিব পিণ্ড পর্যন্ত অবস্থিত। তোমরা আথরোট দেখিলে মস্তিষ্কের আকারের একটা সঠিক নমুনা বুঝিতে পারিবে।

৮। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত বিশুদ্ধাখ্য কেন্দ্র।

৯। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত অনাহত কেন্দ্র।

১০। মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া মূলাধার পর্যন্ত বিস্তৃত সূক্ষ্ম মার্গ। এই মার্গেই ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত।

এবার তোমাদিগকে মস্তিষ্কের বৈজ্ঞানিক চিত্রের সাহায্যে আজ্ঞা, শিবপিণ্ড, সহস্রার বুঝানো যাইতেছে।

I আমাদের মস্তিষ্কটি উল্টাইয়া রাখিলে যে রূপ দেখায় সেই চিত্র।

১। শিবপিণ্ডের সমসূত্র স্থান।

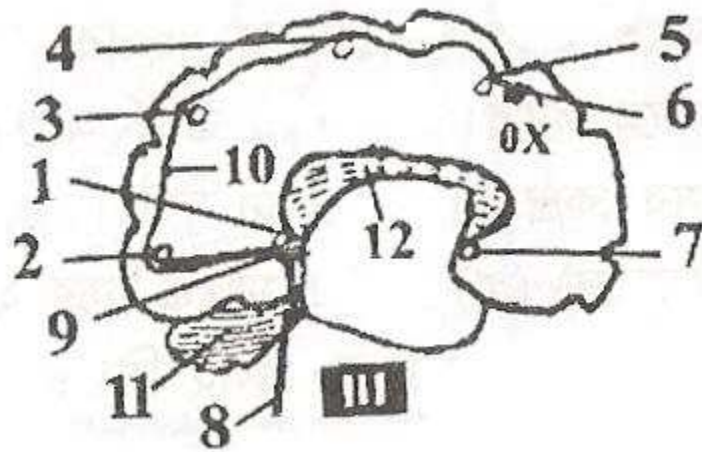
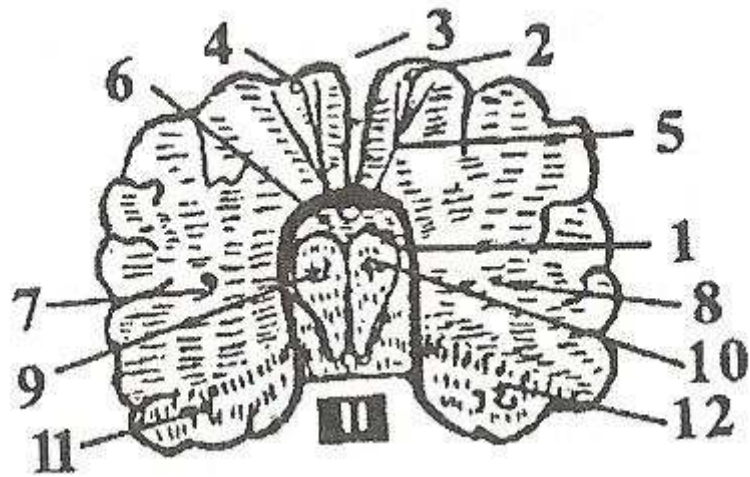
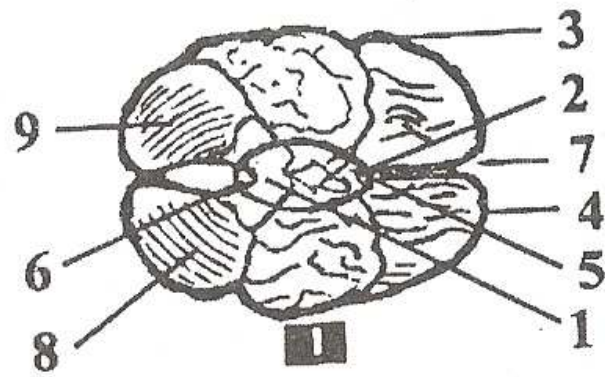
৫। বুদ্ধিস্থানের সমসূত্র স্থান।

৬। প্রাণ কেন্দ্রের সম সূত্র স্থান।

৩। দক্ষিণ মস্তিষ্ক

৭। মস্তিষ্কের কপালের দিক।

৮। ছোট মস্তিষ্ক।



আজ্ঞা, সহস্রার ও শিবপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক স্তম্ভের সঙ্কল্প চিত্র

১। ছোট মস্তিষ্ক।

আমাদের মস্তিষ্কটি যদি উভয় কর্ণের সমসূত্রভাবে কাটা যায় তবে উহার আকার এই চিত্রের মত হয়।

১। শিবপিণ্ড।

৩। উভয় মস্তিষ্ক মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান। এই ফাঁকাস্থানের মধ্যে ১১ ও ১২ অংশ এবং শিবপিণ্ড মিলাইয়া আজ্ঞাচক্র। আজ্ঞাচক্র অংশকে দাঁড়ারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। দাঁড়া রেখা ভিন্ন সমস্ত রুজুরেখা সহস্রার এবং সহস্রার গর্তস্থান জানিবে।

৬। এই অংশই গুরুপাদুকা। ইহাই সহস্রার গর্তাংশ।

III এই চিত্র মস্তিষ্কের ক্রমধ্য ও শিখার সমসূত্রে কাটিয়া দুইভাগ করিলে যে রূপ হয়, উহার চিত্র।

১। মনের কেন্দ্র।

২। সূর্য্য কেন্দ্র।

৩। বিষ্ণু কেন্দ্র।

৪। শিব কেন্দ্র।

৫। উন্নত কেন্দ্র।

৭। বুদ্ধি কেন্দ্র বা গণেশ কেন্দ্র।

৮। মেরুদণ্ড গত ব্রহ্মনাড়ী অংশ বা স্ক্রুমা অংশ।

১০। মস্তিষ্ক স্থিত ব্রহ্মনাড়ী।

১১। ছোট মস্তিষ্ক। ছোট মস্তিষ্কে তোমরা আজ্ঞাচক্রের অংশ ও প্রাণ মস্তিষ্ক জানিবে।

১২। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড।

## লিঙ্গমূর্তি ও শাস্ত্রের প্রমাণ

লিঙ্গমূর্তি সম্বন্ধে তোমরা যাহাতে একেবারে সন্দেহহীন হইতে পার এজন্য শাস্ত্রের প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। পৌরোহিত্যবাদী ও মূর্তিখণ্ডনকারী সম্প্রদায়ের মিথ্যা প্রচারে অনেক ভক্ত সাধককে আমরা বিভ্রান্ত হইতে দেখিয়াছি। কাজেই শাস্ত্রের প্রমাণ দেখ :-

- ১। লিঙ্গনানাং চ ক্রমং বক্ষে যথা বচ্ছৃণুত দ্বিজাঃ।  
তদেব লিঙ্গং প্রথমং প্রণবং সার্বকালিকম্।  
সূক্ষ্ম প্রণব-রূপোহি সূক্ষ্মরূপং তু নিষ্কলম্।  
স্কুললিঙ্গং হি সকলং তৎ পঞ্চাঙ্কর মুচ্যতে।  
তয়ো পূজা তপঃ প্রোক্তং সাক্ষা ন্নোক্ষপ্রদ উভে ॥  
পুরুষ প্রকৃতি ভূতানি লিঙ্গানি স্তবহূনি চ।  
তানি বিস্তরশো বক্তং শিবো বেত্তি ন চাপরঃ ॥  
শিব পুরাণম্

হে দ্বিজগণ (দীক্ষিতগণ) আমি লিঙ্গের ক্রম বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। ইহাদের মধ্যে ‘ওঁ’ই প্রথম লিঙ্গ। এই ওঁই ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কালের স্বরূপ। প্রণব রূপ লিঙ্গের আবার সূক্ষ্মরূপ আছে, সেই সূক্ষ্মরূপই ‘নিষ্কল ব্রহ্ম’। ‘সকল’ অর্থাৎ সমষ্টি বিশ্বকে স্থূল লিঙ্গ বলিয়া জানিবে। ইহা শিবের পঞ্চাঙ্কর মন্ত্রের সমষ্টি। এই উভয় প্রকার লিঙ্গের পূজাই তপস্যা। এই লিঙ্গ পূজা সাক্ষাৎ মোক্ষ প্রদান কারী। পুরুষতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব এবং অনেক প্রকারের ভূততত্ত্ব, (সাংখ্য দর্শন দেখ) সবই লিঙ্গেরই বিভিন্ন রূপ। ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ভিন্ন অন্যে ইহাদিগকে জানিতে পারেন না।

২। সাজ্ঞানামাষুজং বদ্ধিমলকর সদৃশং ধ্যান ধাম প্রকাশং ।  
 হক্ষাভ্যং কেবলাভ্যং পরিলসিত বপূর্নেত্র পত্র স্কুশুভ্রং ॥  
 তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলা বকত্র ষটকং দধানা ।  
 বিদ্যামুদ্রাং কপালং ডমরুজপ বটীং বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা ॥  
 এতদ্ পদ্মান্তরালে নিবসতি চ মনঃ সূক্ষ্মরূপং প্রসিদ্ধং ।  
 যোনৌ তৎ কর্নিকায়ামিতর শিবপদং লিঙ্গচিহ্নপ্রকাশং ॥  
 ষট্চক্রনিরূপণম্ ৩৪। ৩৫ ॥

ক্রয়ুগলের মধ্যস্থলে আজ্ঞা নামে একটি দ্বিদল চক্র আছে। উহা চন্দ্রসম শুভ্রবর্ণ। যোগীদিগের ধ্যানস্থান স্বরূপ, অতীব শুভ্র। ইহার দলদ্বয়ে হক্ষ দুইটি বর্ণ শোভা পাইতেছে। এই আজ্ঞার মধ্যে বিদ্যামুদ্রা, কপাল, জপমালা-ধারিণী চতুর্ভূজা বিমল চিত্তা ষড়াননা ‘হাকিনী’ শক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন। এই পদ্মের অন্তর কর্ণিকা ভাগে সূক্ষ্মরূপী মন প্রসিদ্ধ আছে। (মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ১ কেন্দ্র)। এবং যোনির আকার বিশিষ্ট (দুইটি দলের মধ্যস্থিত) কর্ণিকার মধ্যে ইতর নামক শিবলিঙ্গ প্রকাশমান রহিয়াছেন। দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত এই শিবলিঙ্গ সত্যই যোনির আকার বিশিষ্ট গহ্বরে অবস্থিত। (দেখ মস্তিষ্কে সহস্রার, আজ্ঞা ও শিবপিণ্ড নির্দেশক চিত্রে ৭ স্থান। আজ্ঞা সহস্রার ও শিবপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক সম্বন্ধ চিত্রের II চিত্রে ৩ স্থান দেখ)।

৩। আরাধয়ামি মণি সন্নিভ মাঅলিঙ্গং  
 মায়াপুরী হৃদয় পঙ্ককজং সন্নিবিষ্টং ।  
 শ্রদ্ধানদী বিমল-চিত্ত জলাবগাহং  
 নিত্য সমাধি কুসুমৈর পুনর্ভবায় ॥ হংস ধ্যান।

আমি মণির মত জ্যোতি বিশিষ্ট আত্মরূপ লিঙ্গকে আরাধনা করি। তিনি মায়াপুরী রূপ সহস্রার কমলের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট আছেন। শ্রদ্ধারূপা নদীতে ও জ্ঞানরূপ জলে অবগাহন করিতেছি, সমাধি রূপ কুসুমে পূজা করিতেছি। (শ্রদ্ধাজ্ঞান ইত্যাদি নাড়ী

শিবপিণ্ডে আছে, ক্রমবিকাশ ৮ম অধ্যায়ে দেখ)। তাহাতে আর পুনরাবৃত্তি হইবে না (অর্থাৎ শেষ সমাধি লাভ করিবার যোগানুষ্ঠান করিতেছি)।

৪। আকাশং লিঙ্গ মিত্যাহঃ পৃথিবীতস্য পীঠকা।  
আলয় সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥ লিঙ্গ পুরাণ ॥

আকাশই (আ = ব্যাপ্ত। কাশ = জ্যোতি। অর্থাৎ যিনি ব্যাপক এবং যিনি জ্ঞানময় তিনিই লিঙ্গ) লিঙ্গ। পৃথিবী (অর্থাৎ মূলাধার চক্র) তাঁহার পীঠ স্বরূপ। ইহাতে সমস্ত দেবতা অবস্থান করেন এবং সমস্ত দেবতা ইহাতে লয় প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার নাম লিঙ্গ (অর্থাৎ লিঙ্গ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মই লিঙ্গ)।

৫। আলয় লিঙ্গমিত্যাহ ন লিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে।  
যস্মিন্ সর্বানি ভূতানি লীয়ন্তে বুদ্ধদাইবা ॥

তিনি সর্বভূতের আলয় বলিয়াই তাঁহার নাম লিঙ্গ। লিঙ্গ মূর্ত্তিকে লিঙ্গ মনে করিও না। এই লিঙ্গে বা (লীনং গচ্ছতি ইতি) ব্রহ্মে সমস্ত সৃষ্টি জলের বুদ্ধদের মত বিলীন প্রাপ্ত হয়।

৬। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ (বেদান্ত সূত্রম্)

আকাশ তাঁহার (ব্রহ্মের) লিঙ্গ।

৭। লিঙ্গাচ্চ ॥ (বেদান্ত সূত্রম্) ॥

বিলীন করিবার অভ্যাস বা সমাধিই লিঙ্গ।

৮। স্থিতা স্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎ কুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে।  
শান্তে স্বান্ত প্রলীনে প্রকটিত বিভবে জ্যোতিরূপে পরাখেয় ॥  
লিঙ্গং তদ্ ব্রহ্মবাচ্যং সকল তনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি।  
ক্ষন্তব্যং মে অপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥  
শিবাপরাধ স্তোত্রম্।

যাহা (যে লিঙ্গ) প্রণবময় এবং বায়ুময় (জীবনী শক্তিময়) রূপে (স্বষুন্না নামক) সূক্ষ্মমার্গে (মূলাধার পদে) কুণ্ডলিত ভাবে অবস্থানে করিতেছেন, যাহা মনকে শান্ত করিয়া অহংরূপ আত্মভাবকে প্রলীন করিতে সমর্থ, যাহা অনন্ত ঐশ্বর্যের আশ্রয়, যাহা জ্যোতিঃ স্বরূপ (জ্ঞানময়), যাহা পরম ব্রহ্ম নামে খ্যাত, যাহা সমস্ত জীবের মধ্যে (ব্রহ্মনাড়ী ও

কুণ্ডলিনী রূপে) অবস্থান করিতেছেন; যাহা মঙ্গলময় এবং যাহা ব্রহ্ম নামে খ্যাত, সেই 'লিঙ্গ' কে স্মরণ করি নাই। হে অনন্ত মঙ্গলময় শিব! হে সমতার স্বরূপ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

৯।            ॐ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।  
                  উর্দ্ধ্ব লিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো-নমঃ ॥ সামবেদ।

তিনি (পরম ব্রহ্ম) অবিনাশী, তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি কৃষ্ণপিঙ্গল পুরুষ (অগ্নিরূপ পুরুষ), তিনি উর্দ্ধ্ব লিঙ্গ (অর্থাৎ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত), তিনি অরূপ, তিনি বিশ্বরূপ তাঁহাকে বার বার প্রণাম।

১০। তোমরা লিঙ্গ মূর্তি মাত্রই মস্তিষ্কের মূর্তি জানিবে। ঠিক ঠিক মস্তিষ্কের আকার বিশিষ্ট লিঙ্গ মূর্তি খুব কম দেখা যায়। কাশীতে গোদৌলিয়া হইতে বুলানালা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তার ধারে যাইতে ডান দিকে (হাউস কাটারার নিকটে) এক সর্বজন পূজ্য প্রাচীন লিঙ্গমূর্তি আছে। মূর্তিটি একটু গর্তের মধ্যে খোলা স্থানে অবস্থিত (সংলগ্ন বাড়ীর নম্বর মনে নাই)। এই মূর্তিটি ঠিক মস্তিষ্কের আকার বিশিষ্ট।

শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আরও বহু তথ্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। মূর্তি নিলুকের মধ্যে খৃষ্টবাদী ও ইসলামীয়ারাই বেশী প্রসিদ্ধ। কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখ প্রাচীন খ্রীষ্টানদের মন্দিরে শিব লিঙ্গ পূজিত হইত। মেডাম ব্লাভস্কি লিখিত 'ইসিস্ আনভেইল' নামক পুস্তকে এই কথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্খ খৃষ্টানরা পরবর্ত্তীকালে কুৎসিত কিছু মনে করিয়া ঐ লিঙ্গ মূর্তি ফেলিয়া দিয়াছে এবং ত্রুশের স্থাপন করিয়াছে। ২টা প্রস্তরে সেই লিঙ্গমূর্তি গঠিত ছিল। নীচের পাথরের নাম ছিল স্ট্রী পাথর বা 'অ' এবং উপরের পাথরের নাম ছিল 'উম্' বা পুং পাথর। তোমরা দেখিতেছ অ + 'উম্' = 'ওঁ' হইল। এই 'ওঁ'ই শব্দ ব্রহ্ম। বাইবেলে এই 'শব্দ ব্রহ্মকে' বা শিব লিঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া একটী বাণী আছে - In the beginning there was the word. That word was God. That word was with God\* . (দেখ বাইবেল যোহ্ন বাক্য)। (আরম্ভে শব্দ ছিল। সেই শব্দ ঈশ্বর ছিল। সেই শব্দ ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল।) কুরান ও মুসলমান শাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায় মক্কাতে ৩৬০টা বৃত্ত ছিল। মুসলমানেরা সেই সব-গুলি মন্দিরকে ভাঙিয়া মাত্র একটীকে রক্ষা করে। আজ কাল ঐ শিব মন্দিরই 'কাবা'র মন্দির নামে খ্যাত। সেখানে এই শিলামূর্তির নিকটে মুসলমানগণ বলিদান পূজাদি করিয়া থাকেন। হিন্দু শাস্ত্রে এই মন্দিরের উল্লেখ আছে। মহম্মদ এই

\* প্রকাশকের নিবেদন - King James Version-এ John 1:1 : "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."

প্রাচীন হিন্দু তীর্থ-মন্দিরে অমুসলমানগণের পূজা ও প্রবেশাধিকার বাতিল করেন। কুরানে এই কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। (সূরাহ্ বারায়ত। আঃ ১৭)

খৃষ্টবাদী ও মুসলমানগণ সেই 'প্রণব লিঙ্গ' বা 'শব্দ ব্রহ্ম' দার্শনিকতা হইতে কোথায় সরিয়া গিয়াছে উহা যদি তোমরা কখনও বাইবেল ও কুরান আলোচনা কর তবে বুঝিতে পারিবে। কুরান বাইবেল হইতেই 'গড্'এর দার্শনিকতার হুবহু নকল করিয়াছে এবং বেদ প্রতিপাদ্য ঈশ্বর ও ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। যদি বেদের দার্শনিকতা তাঁহারা মানেন তবে কুরানের মতে তাঁহারা কাফের হইবেন। আবার কুরানের দার্শনিকতাকে যদি ইঁহারা বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবুও তাঁহারা কাফের। আজকাল অনেক মুসলমান আল্লাহ্ মিঞাকে 'ব্রহ্ম' করিবার চেষ্টা করিয়া কাফের সাজিতেছে দেখা যায়।

আকাশের কোন কোণে গড্ বা আল্লাহ্ অবস্থান করেন। তিনি কেয়ামতের সময় সব মৃত আত্মার বিচার করিয়া কাহারও জন্ম অনন্ত দুজক এবং কাহারও জন্ম অনন্ত কালের জন্ম বহিস্তের ব্যবস্থা করিবেন।

খৃষ্টান পাদরীরা রাস্তায় ঘাটে, তাহারা মূর্তি পূজা করে না বলিয়া ভারী বাহাদুরী দেখায়। কিন্তু তাহারা ঈঁহাকে ঈশ্বর বলে উহা আমাদের পুরাণ কল্পিত যমরাজ তুল্য বা প্রেতেশ্বর সমতুল্য নহে। খৃষ্টানদের ধর্ম শাস্ত্রে স্বর্গে সাত শিং ও সাত নেত্র ওয়ালা এক বিকট মূর্তিধারী ঈশ্বরের কথা আছে। ইসলামীরাও মনে করে তাহারা মূর্তি পূজা করে না। কিন্তু মূর্তি পূজা যে তাহারা করে উহার প্রমাণ মক্কাতে বিদ্যমান। কুরানেও ঐ কাবার দিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িতে বলা হইয়াছে। সূরা ২ আঃ ১৪৪। আমরা মূর্তি পূজা করি, কিন্তু উহা নির্গুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা। যাহারা ঐ তত্ত্ব পায় না তাহারা সকলেই প্রেত জগতে যায় অর্থাৎ যমের বাড়ী যায়। প্রেতের বিচার যমের কাজ। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ঐ সব কার্য হইতে পরপারে। তোমরা গণেশ, শিবাди সগুণ ব্রহ্মের এবং বহু দেব দেবীর মূর্তি দেখিতে পাইবে, কিন্তু ঈশ্বর মূর্তি বা ব্রহ্ম মূর্তির কথা শাস্ত্রে কোথাও নাই। কুরানের আল্লাহ মিঞা যে মানুষের মত আকার বিশিষ্ট একথা কুরানে আছে। কুরানে স্পষ্ট বলা আছে যে তিনি আদমের মূর্তি নিজের মতন করিয়া গড়িয়াছেন। (দেখ সূরা 'আরাজ'। আঃ ১১)।

ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুদের দার্শনিকতা খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম হইতে অন্যরূপ। তিনি ব্যাপক ও নির্লিপ্ত, বিচার বা অবিচার রূপ কর্মের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি আমাদের শরীরস্থিত ব্রহ্মনাড়ীতে অবস্থান করিয়া বিরূপ নির্লিপ্ত সে সম্বন্ধে তোমরা উপনিষদ পাঠ করিয়া জানিবে। গীতা হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা-

- ১। সর্ব কর্ম্মাণি মনসা সংন্যাস্তে স্খংবশী।  
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্ ॥ ৫-১৩ ॥

বশী (আত্মা) এই নবদ্বাররূপ শরীরে মন দ্বারা সমস্ত কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্বেচ্ছা অবস্থান করেন (মন যোগদ্বারা বৃত্তিহীন হইলে কোন কর্মেই মনের লিপ্ততা থাকে না)। তিনি করেনও না, করানও না।

২। ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।

ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ৫-১৪ ॥

প্রভু (ঈশ্বর, আত্মা, বা ব্রহ্ম) কাহারও জন্ম কর্তৃত্ব কর্ম ও কর্মফল সৃজন করেন না। এই সব স্বাভাবিক নিয়মে প্রবর্তিত হয়।

৩। ন দত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব স্কৃতং বিভুঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুস্তি জন্তবঃ ॥ ৫-১৫ ॥

বিভু (ব্যাপক আত্মা) কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না। মানুষের মন অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইবার দরুণ মোহিত হয় (অর্থাৎ মূর্খতা বর্বরতা করিয়া থাকে)।

৪। জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেস্যাং নাশিতমাঅনঃ।

তোস্যাং আদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ৫-১৬ ॥

যাঁহাদের অজ্ঞান আত্মজ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের জ্ঞান সূর্যের মত প্রকাশিত হয়। (তোমরা দেখিতেছ ঈশ্বরকে আকাশে কল্পনা করা ও তাঁহাকে মৃতের বিচারক মনে করা হিন্দু শাস্ত্র মতে অজ্ঞানতা মাত্র।)

কর্ম ধর্ম, উপাসনা ধর্ম, ও জ্ঞান ধর্ম তিনটী ব্যাপারেই খৃষ্টবাদী ও মুসলমানগণ আসল বৈদিক ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তোমরা বেদ প্রতিপাদ্য কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান-ধর্মের অনুশীলনকে জীবনের অত্যন্ত পবিত্র ও প্রয়োজনীয় বস্তু মনে করিবে এবং বাইবেল ও কুরানেরও আলোচনা রাখিবে। প্রতিবেশীর কর্ম, ধর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে তোমাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সর্ব ধর্ম সমন্বয়ীদের মিথ্যা কথায় বিভ্রান্ত হইও না।

একদিকে ক্রমবিকাশবাদ বা জন্মান্তরবাদ অন্যদিকে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরকবাদ, একদিকে ব্যাপক ঈশ্বরত্ব এবং অন্যদিকে আকাশের কোণে বাড়ী ঘর করিয়া বাসকারী ঈশ্বরত্ব; এইরূপ দুইটা বিরুদ্ধ কথা এক বস্তু হইতে পারে না। যদি ইহার একটা সত্য হয় তবে অন্যটা নিশ্চয়ই মিথ্যা। একদিকে লক্ষ লক্ষ বৎসরের যোগী ঋষিদের দ্বারা পরীক্ষা করা সত্য, অন্যদিকে কল্পনা বিলাসীর কল্পনা। যাঁহারা ধর্ম সমন্বয় করিয়া বেড়ান তাহাদিগকে আমরা কুরান পড়িতে অনুরোধ করি।

খৃষ্টান পাদরীগণকে অত্যন্ত অন্যায়ে ভাবে হিন্দু ধর্ম আক্রমণ করিয়া ধর্ম প্রচার করিতে দেখা যায়। সে সম্বন্ধে তোমরা সাবধান হইবে। যথা -

পাদরী - আমি যদি তোমার শিব ঠাকুরকে এই লাঠী দ্বারা খোঁচা মারি সে কি করিতে পারে?

উত্তর - আমি যদি মিঃ গড্কে 'হারামজাদা' বলি সে আমার কি করিতে পারে?

পাদরী - গড্ তোমাকে পরলোকে নরকে ফেলিবেন।

উত্তর - শিব তোমাকে পরকালে তাঁহার ত্রিশূল দ্বারা খোঁচাইতে থাকিবেন এবং তোমাকে কুষ্ঠ রোগী করিয়া আমাদের সামনেই একটা ঘৃণিত পাপী করিয়া জন্ম দিবেন।

তোমরা মূর্খদের কথায় আত্মবিশ্বাস হারাইবে না। 'মূর্ত্তি' যোগবিদ্যা ও আত্মজ্ঞান শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অবলম্বন। যেমন মানচিত্র না হইলে ভূগোল শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব ঠিক সেইরূপ মূর্ত্তির অবলম্বন না করিলে উন্নত জ্ঞানভূমির দার্শনিকতাকে ব্যাখ্যা করা সহজ হয় না। তোমরা পত্রিকায় কার্টুন দেখিয়া থাকিবে। ছবিদ্বারা সংবাদ প্রচার যত সহজ, সংবাদের বিবরণ লিখিয়া সংবাদ প্রচার তত সহজ হয় না।

তোমরা ব্রহ্ম স্তোত্র ও গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সগুণ ব্রহ্মোপাসনার অনুষ্ঠান করিবে। অথবা পূজানুষ্ঠানের অন্তে গায়ত্রী ও ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করিবে; কারণ সগুণ ব্রহ্মোপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের কয়েকটি সিঁড়ী মাত্র।

সগুণ ব্রহ্মোপাসনার এই সব স্তরগুলি সবই ব্যাপক। আমাদের মন একদিনে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মজ্ঞানের উপযুক্ত হয় না। স্তরে স্তরে জ্ঞানের ভূমিগুলি অতিক্রম করিতে হয়। সেই সব ভূমিগুলিই সগুণ ব্রহ্ম নামে খ্যাত। সগুণ ব্রহ্মের স্তুতি সম্বন্ধীয় কয়েকটি শ্লোক দেওয়া যাইতেছে। তোমরা স্মবিধামত ঐগুলি আয়ত্ত করিবে এবং সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মস্তোত্ররূপে যে কোন মন্দিরে বা পূজাদিতে গাইতে পারিবে।

১। ওঁ শান্তাকারং ভূজঙ্গ শয়নং পদ্মনাভং সুরেশং

বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।

লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগীভির্ধ্যানগম্যং

বন্দেবিষ্ণুং ভবভয়হরণং সর্বৈ লোকৈক নাথং ॥

যিনি শান্ত আকার বিশিষ্ট (অস্তঃকরণ শান্ত হইলে যে তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয় সেই তত্ত্বই শান্ত আকার), সর্প (ব্রহ্মনাড়ী) যাঁহার বিছানা (অর্থাৎ ব্রহ্মনাড়ীতে যিনি ব্যাপ্ত), যাঁহার নাভীতে পদ্ম রহিয়াছে (যোগের ত্রিফলা বিশেষ দ্বারা মনকে নাভি স্থানে আবদ্ধ রাখিতে পারিলে বিষ্ণু স্তরের অনুভূতি পাওয়া যায়), যিনি মেঘবর্ণ (মনস্তির হইলে মেঘের মত রং বিশিষ্ট ব্যাপক অনুভূতি ফোটে), মঙ্গলই যাঁহার অঙ্গ (যত প্রকার মঙ্গলপূর্ণ ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে সেই সবই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ), যিনি ঐশ্বর্যের ঐশ্বর (বিষ্ণু স্তরের সঞ্চিত কর্মগুলি ঐশ্বর্য ও মঙ্গলপূর্ণ ঘটনারূপে ফলোন্মুখ হইতে থাকে), যিনি স্নেহময় দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখেন, যোগীজন ধ্যান দ্বারা যাঁহাকে লাভ করিতে পারেন, যিনি ব্যাপক ঐশ্বর, যিনি জগতের সব ভয় নাশ করেন এবং সমস্ত জগতের একমাত্র ঐশ্বর তাঁহাকে প্রণাম করি।

২। ওঁ বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎ কারণম্।

বন্দে পন্নগ ভূষণং মৃগধরং বন্দে পশুনাং পতিম্।

বন্দে সূর্য্য শশাঙ্ক বহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দ প্রিয়ং ।

বন্দে ভক্ত জনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিব শঙ্করং ॥

যিনি ওঁকার রূপী স্বামী বা ঈশ্বর (উমা = উ+ম্ +অ +অ = ওঁ) তাঁহাকে প্রণাম, যিনি বিশ্ব জগতের বীজ স্বরূপ এবং বীরদের গুরুদেব তাঁহাকে প্রণাম। যিনি মৃগকে (কামের বেগকে) ধারণ করিয়া আছেন (অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মচারী) এবং যাঁহারা সম্যক্ অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের যিনি ঈশ্বর তাঁহাকে প্রণাম (পাণিনি দ্রঃ, পশু = সম্যক)। সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নি যাঁহার নেত্র স্বরূপ এবং যিনি জ্ঞানদাতা ও জ্ঞানীদের প্রিয় তাঁহাকে প্রণাম। যিনি ভক্তজনের আশ্রয় ও স্নেহশীল তাঁহাকে প্রণাম। যিনি মঙ্গলময় ও মঙ্গল করেন তাঁহাকে প্রণাম।

৩। ওঁ স্থিতা স্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎ কুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে ॥  
শান্তে স্বান্ত প্রলীনে প্রকটিত বিভবে জ্যোতিরূপে পরাখেয় ॥  
লিঙ্গং তদ্ ব্রহ্মবাচ্যং সকল তনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি ।  
ক্ষন্তব্যং মে অপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ।  
ইহার অর্থ মূর্ত্তি বিজ্ঞান অংশে দেখ।

৪। শূক্ৰাং ব্রহ্ম-বিচার-সার-পরমা মাদ্যাং জগদ্ব্যাপিনীম্ ।  
বীণা পুস্তক ধারিণীমভয়দাং জাচ্যাক্ষকারাপহাম্ ॥  
হস্তে স্ফটিক মালিকাং বিদধতিং পদ্মাসনে সংস্থিতাম্ ।  
বন্দে তাং পরমেশ্বরীং ভগবতীং বুদ্ধিপ্রদাং সারদাং ।

যিনি শুভ্ররূপে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠবিগ্রহ, যিনি শ্রেষ্ঠা, যিনি আদ্যাশক্তি রূপিনী, যিনি বিশ্বব্যাপিনী, যিনি বীণা ও পুস্তক ধারণ করিয়াছেন (অর্থাৎ বীণা যন্ত্র ও গ্রন্থদ্বারা যাঁহার জ্ঞানময়ীরূপ জগতে প্রচারিত হয়), যিনি অভয়দান করেন (অর্থাৎ জ্ঞানীর ভয় থাকে না), জড়তা (মূর্খতা) রূপ অন্ধকার যিনি নাশ করেন, যাঁহার হস্তে স্ফটিকমালা (অর্থাৎ যিনি নিজের কর বা কর্ম্ম শক্তি দ্বারা জ্ঞানই প্রতিষ্ঠা করেন) ধৃত আছে, যিনি পদ্মাসনে সংস্থিত আছেন (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যস্থিত মস্তিষ্ক মর্্ম্মকেন্দ্রে অবস্থান করেন), সেই জ্ঞানরূপী জ্ঞানদায়িনী ভগবতী ও শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরীকে প্রণাম করি।

৫। যা কুন্দেন্দু তুষার হার ধবলা যা শুভ্র বস্ত্রাবৃত্তা ।  
যা বীণা-বর-দণ্ড-মণ্ডিত-করা যা শ্বেত-পদ্মাসনা ॥  
যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্করঃ প্রভৃতিভি দৈবৈঃ সদা বন্দিতা ।  
সা মাংপাতু ভগবতী সরস্বতী নিঃশেষ জাচ্যাপহা ॥

যিনি কুন্দ (পুল্ল), চন্দ্রমা ও বরফ পর্ব্বতমালার মত ধবলা, যিনি শুভ্র বস্ত্রদ্বারা আবৃত্তা (অর্থাৎ শান্তির আবরণ ভেদ হইলে জ্ঞান লাভ হয়) যিনি বীণা, বর, দণ্ড হস্তে ধারণ করিয়াছেন, যিনি শ্বেত পদ্মে অবস্থিত আছেন (মস্তিষ্কের মর্্ম্মস্থলকে শ্বেত পদ্ম বলে), যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ দ্বারা সদা পূজনীয়া (অর্থাৎ মনের স্তর, বিষ্ণু স্তর

ও শিবস্তরের উপরে উন্নত শিবের স্তর বা জ্ঞানের স্তর অবস্থিত), নিঃশেষে অজ্ঞানতা নাশকারী ভগবতী সরস্বতী আমাকে পবিত্র করুন। (বীণা = ধ্বনি বিজ্ঞানের যন্ত্র, ধ্বনিই জ্ঞান বিভূতি। বর = জ্ঞানী বা গুরুর আশীর্বাদই বর বা স্নেহ। গুরুর স্নেহ দ্বারা জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। দণ্ড = ব্রহ্মচর্য্য বেশ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়)।

## অবতার উপাসনা

ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কীটাদি পর্য্যন্ত এবং সাধারণ মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ স্তরের মহাপুরুষ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবে একই আত্মা বিদ্যমান। কিন্তু সকলের জ্ঞান সমান নহে। কেহ কম জ্ঞানী এবং কেহ বেশী জ্ঞানী। জ্ঞানের এই ভাগকে হিন্দু শাস্ত্রে ‘কলা’ বলে। তোমরা শুনিয়া থাকিবে শ্রীকৃষ্ণ ১৬ কলার মহাত্মা ছিলেন। এই কলাকে ‘পূর্ণ কলা’ বলে। কোন্ জীবে কোন্ কলার জ্ঞান বিদ্যমান সেই সম্বন্ধে তোমাদের জানা প্রয়োজন। জীবের জ্ঞান যখন অষ্টম কলা অতিক্রম করিয়া নবম কলায় আসিয়া দাঁড়ায় বা ৯ম হইতে উর্ধ্ব কলায় বিকশিত হয় তখন উহাকে অবতার কলা বলা হয়। প্রত্যেক জীবেরই কর্ম্ম চরিত্রে ও জ্ঞানে নিজ নিজ বিকাশ অনুরূপ চরিত্র প্রতিভাত হয়। এই সব চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে শিক্ষা করিলে তোমরা যে কোন মানুষকে চিনিতে পারিবে এবং নিজের চরিত্র স্কন্দর ও কর্ম্মময় করিতে পারিবে।

অনেকের ধারণা ঈশ্বরের কোথাও বাড়ীঘর আছে। সেইখান হইতে তিনি অবতার বা মহাপুরুষ পাঠাইয়া থাকেন। এইরূপ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। তোমরা জানিয়া রাখিবে ঈশ্বর তত্ত্ব ব্যাপক। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের যত বেশী ও সঠিক জ্ঞান হয় আমরা ততই খাঁটী ও শ্রেষ্ঠ মানুষ হইয়া থাকি। আমরা যত উচ্চ স্তরের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি লাভ করি আমরা ততই উচ্চস্তরের মহাপুরুষ হইয়া থাকি। উচ্চস্তরের জ্ঞান এবং কর্ম্মশক্তিই মানুষকে মহাপুরুষ বা অবতারে পরিণত করে। অবতার চরিত্রের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা কোন না কোন প্রকার আঙ্গরিকতার মূল উচ্ছেদ করিয়া যান। ইদানীং আমাদের দেশের অনেক লোকেরই অবতার সম্বন্ধে ধারণা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা ষষ্ঠ কলার মহাপুরুষগণকেও অবতার মনে করেন। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আমাদের সমাজে হইবার দরুণ আমাদের সমাজ বর্তমানে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছে। তোমরা অবতার কলা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিশ্চয়ই ত্যাগ করিবে।

১ কলায় উদ্ভিজ্জ সৃষ্টি। ২ স্বেদজ। ৩ অণুজ। ৪ জরায়ুজ। চারের সামান্য অধিক হইলেই মানুষরূপে জন্ম হয়। এ সম্বন্ধে ‘ক্রমবিকাশ’, ‘শক্তিবাদ’, ‘শক্তিশালী সমাজ’ প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

৪ কলার সাধারণ মানুষ। ইহারা সরল ধর্ম্মে বিশ্বাসী, প্রেত উপাসক, মোটেই বুদ্ধিমান নহে। মুটে মজুর, পেয়াদা, দপ্তরী, চাপ্রাসী, পূজারী, রাঁধুনি, চাওয়াল, সাধারণ হোটেল ওয়াল, মেথর, প্রেস কম্পার্জিটার, সহিস, গাড়োয়ান প্রভৃতি এই কলার বিকাশ। ইহাদিগকে নিম্ন স্তরের শিব-বিকাশ জানিবে।

৫ কলার বিকাশে গণেশ লক্ষণযুক্ত মানুষ। বিশেষ লক্ষণ ‘কঠোর প্রকৃতি’। অন্যায়ে বিরোধী, ত্যাগী প্রকৃতি, যুদ্ধ প্রিয়, উদার মনোবৃত্তি সম্পন্ন, একটু একপুঁয়ে, চরিত্রবান, স্বদেশ প্রেমী, কষ্ট সহিষ্ণু, ন্যায়নিষ্ঠ, দৃঢ়ভাষী, সাহসী, জড় বিজ্ঞানে নিষ্ঠা সম্পন্ন, অন্ধবিশ্বাস বিরোধী। উন্নত চরিত্র আয়ত্ত করিতে হইলে ৫ কলার লক্ষণ খুব সহায়ক হয়। বিচারক, ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, যুবকদের নেতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এস্তরের মানুষ বেশী পাওয়া যাইবে।

৬ কলার বিকাশে সূর্য্য লক্ষণযুক্ত মানুষ। বিশেষ লক্ষণ ‘কোমল প্রকৃতি’। মেয়েলী প্রকৃতি, কৃপণ স্বভাব, হিসাবী, মেধাবী, যশস্বী, বিশ্বাসবাদী, ভাবপ্রবণ। দুইটা বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে পড়িলে সমাজের সর্বনাশ করিয়াও উভয় দিকের প্রিয় হইতে চেষ্টা করেন। আদর্শের দিকে ঝোঁক বেশী, ফলে লক্ষ্য গুলাইয়া যায়। মেয়েদের মধ্যে এ কলার বিকাশ থাকিলে দানশীলা হন। ইহাকে জগৎগুরু কলা বলে। শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক, উকিল, ডাক্তার, রাজদূত, বক্তা, সংবাদপত্র সেবী, পুরোহিত, গায়ক, কবি, ভাবুক, ভাববাদী, সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী, সেবাপ্রমী, অহিংসাবাদী, কেরাণী ও জ্যোতিষিগণের মধ্যে এ স্তরের মানুষ বেশী পাওয়া যায়। এ স্তরের ভালো বিকশিতগণই জগৎগুরুর স্থান পাইয়া থাকেন।

৭ কলার বিকাশকে বিষ্ণুস্তরের বিকাশ বলে। বিশেষ লক্ষণ ‘গম্ভীর প্রকৃতি’। সমাজশাসক ও সমাজনেতা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। সন্দিগ্ধ প্রকৃতি কিন্তু উহা কথায় ও ব্যবহারে বুঝা যায় না। চক্রী। মনের ভাব, কথা ও কার্য একই প্রকারের হয় না। সংগঠন করিবার পক্ষে উপযুক্ত।

৭ কলা হইতে আঙ্গুরিক বিকাশ হইয়া থাকে। দৈবী বিকাশসম্পন্ন সাতকলা এবং আঙ্গুরিক বিকাশসম্পন্ন ৭ কলায় চরিত্রগত ভেদ আছে। আঙ্গুরিকগণ নিষ্ঠুর হৃদয়, উৎপীড়ক, শোষক ও স্বেবিধাবাদী। দৈবী সম্পন্নগণ কোমল হৃদয়, সমাজ-হিতৈষী বীর, দাতা, উদার চরিত্র।

রাজা, জমিদার, বণিক, শাসনকর্তা, রাজপ্রতিনিধি, গোয়েন্দা, পুলিশ কর্মচারী প্রভৃতির মধ্যে এই কলার চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

৭ কলার বিকাশের মত মানসিক লক্ষণ কিন্তু বিকাশে ৪১০ বা ৬ কলার মত স্বভাব এমন এক স্তরের মানুষ পাওয়া যায়। ইহাদিগকে তোমরা অপূষ্ট কলা বা ‘কুবিষ্ণু’ বিকাশ জানিবে। ইহারা অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির মানুষ। ইহারা সমাজের ভীষণ ক্ষতি করে। নির্লজ্জ, মিথ্যুক, চাটুকার, অত্যন্ত স্বার্থপর, চোর, গুণ্ডা। ইহারা এত নির্লজ্জ যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নূতন নূতন মিথ্যা কথা বলিতে পারে। বর্তমান যুগে রাজনীতিক্ষেত্রে, অদর্শনিক বিশ্বাসবাদী ধর্মের আড়ালে এবং নিম্নতম পুলিশে এ স্তরের মানুষ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

৮ কলার বিকাশকে উন্নত শিবস্তরের বিকাশ বলে। ইহা ঋষি কলা। ত্যাগী, যোগী, সাধক, তপস্বীগণের মধ্যে এ স্তরের লোক পাওয়া যায়। এ স্তরের বিকাশ আজকাল খুবই কম। ইহারা ৭ কলা হইতেও বুদ্ধিমান। কিন্তু সব রকম বুদ্ধি ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইহারা কোনটারই প্রয়োগ করেন না। সরল, উদার, ত্যাগ ও প্রাকৃতিক জীবনপ্রিয় হন।

৯ কলার অবতার কলা। ৫, ৬, ৭ কর্ম্মীকলা এবং ৮ কলাকে জ্ঞানকলা জানিবে। এই জ্ঞান-কলা অতিক্রম করিলে জীবত্বের মোহ, সম্প্রদায়ের মোহ ভাঙ্গিয়া যায় এবং সমাজ প্রেমের স্বাভাবিক কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া আঙ্গুরিকতা ও বর্বরতা ভাঙ্গিবার জন্য কর্ম্ম করেন। জ্ঞান কলার স্বাভাবিক লক্ষণ যোগ, ধ্যান, তপস্যা ও ত্যাগ প্রধান জীবন এবং সোজা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া কর্ম্ম করিতে চান না, বড় জোর কর্ম্মীদিগকে পরামর্শ দেন। কিন্তু অবতার কলায় আসিলে প্রত্যক্ষ কর্ম্ম করেন ও আঙ্গুরিকগণকে নাশ করেন। ৫×২= ১০। ৬×২=১২। ৭×২=১৪। অর্থাৎ গণেশ কলার চরিত্র হইলে ৯ ও ১০ কলার অবতার। সূর্য্য কলার অবতার ১১ ও ১২ কলার অবতার। বিষ্ণু কলার অবতার = ১৩ ও ১৪ কলার অবতার। ইহাই মোটামুটী লক্ষণ। প্রত্যেক অবতার কলাতে ৫, ৬, ৭ কলার লক্ষণ যথেষ্ট থাকে। তবে খুব প্রধানতার ভিত্তি ধরিয়া বিচার করিতে হয়। লেনিনএ ৫ কলার বৈশিষ্ট্য বেশী। শ্রীরামচন্দ্রে ৬ ও ৭ কলার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শ্রীবুদ্ধে ৭ ও ৮ কলার বিশেষতা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আরও উন্নত। লেনিনের কর্ম্মবিজ্ঞান খুব কম কলার হইবার দরুণ উহা একটি আঙ্গুরিকতা ভাঙ্গিয়া আরও একটি স্থাপনা করাইয়াছে। শ্রীরামের দুর্বলতা থাকিবার দরুণ তাঁহার দ্বারা পৌরোহিত্যবাদ প্রশ্রয় পাইয়াছে। শ্রীবুদ্ধ পৌরোহিত্যবাদ ভাঙ্গেন, কিন্তু বেদকে আঁকড়াইয়া ধরিতে ভুল করেন। ফলে এক শক্তিশালী জ্ঞানের ভাঙার পুরোহিতগণের হাতে রহিয়া গেল। শ্রীবুদ্ধ ইহা আঁকড়াইয়া রাখিলে তাঁহার শক্তির গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইত। ৮ম কলা শান্তি প্রধান কলা এবং ৭ম হইতে ৮ম শ্রেষ্ঠ। এজন্য বৌদ্ধবাদীরা শান্তিতে খুঁকিয়া যায় এবং দুর্বলও হইয়াছিল।

আজকাল আমাদের সমাজে ভাববাদী মহাত্মাগণকে অবতার করিবার রেওয়াজ দেখা দিয়াছে। এইরূপ মানুষকে অবতার করা ও অবতার মানা আমাদের জাতীয় জীবনের অত্যন্ত অধঃপতনের লক্ষণ। তবে একথা সত্য যে অনেক মহাত্মা আছেন যাঁহারা জগৎগুরু কলার মহাত্মা (ষষ্ঠ কলা)।

**শ্রীকৃষ্ণ।** শ্রীকৃষ্ণ ১৬ কলার মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি অবতার কলা অতিক্রম করিয়াছিলেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলার অনেক কথা ভক্তিবাদ ও ভক্তি সাধনার স্বেবিধার জন্য সাজানো হইয়াছে। উহাদের অনেক কথার বাস্তব ভিত্তি নাই। কৃষ্ণকে তোমরা মহাভারতে খুঁজিবে। তিনি কুরুক্ষেত্রে নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন শ্রেষ্ঠ পুরুষ পৃথিবীতে আর হয় নাই। গীতা এই মহাপুরুষের বাণী। ইনি ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত ভারতের হিন্দুমাত্রই জন্মাষ্টমী উৎসব অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে ইনি নিজের প্রিয় শিষ্য অর্জুনের নিকট বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি বেদ প্রতিপাদ্য কর্ম্ম - আঙ্গুরিকতার উচ্ছেদ, উপাসনা - শক্তি বা ব্রহ্মোপাসনা এবং জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের দার্শনিকতার সমস্ত রহস্য গীতায় উদ্ঘাটিত করেন। তোমরা শ্রীকৃষ্ণের পার্থসারথীরূপের কথাই ভাবিও। আজ গীতা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু। গীতাকে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মানিলে সমস্ত অহিন্দু ধর্ম্ম মিথ্যা ও কাল্পনিক ধর্ম্মে পরিণত হইয়া যায়। মূর্খদের মূর্খতা এবং বর্বরদের বর্বরতা আজও ধর্ম্মের নামে চলিতেছে এবং

গীতার মত গ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণের মত গুরু থাকিতে আমরা পরাধীন। এই পৃথিবীতে ইহা সত্যই বিস্ময়কর ঘটনা। আসল কথা পৌরোহিত্যবাদী ও ভাববাদী টীকাকারগণ আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তোমরা ভাগবতের আলোচনা ত্যাগ করিয়া মহাভারতের আলোচনা করিবে। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত জীবনী আছে; কিন্তু মহাভারতে তাঁহার সত্যিকার জীবনী স্থান পাইয়াছে। মহাভারত আমাদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

**শ্রীরাম।** ইনি ১২ হইতে ১৩ কলার মধ্যে বিকশিত ছিলেন। মূল রামায়ণে এই মহাপুরুষের জীবন চরিত্র পাঠ করা কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় এই মহাপুরুষের জীবনে অনেক দুর্বলতা ও ভ্রান্তি ছিল। ইনি আমাদের সমাজজীবনে অতীব প্রিয় ও পূজনীয় মহাত্মা। চৈত্র রাম নবমীতে এই মহাপুরুষের জন্মোৎসব হইয়া থাকে। ইনি রাবণ বধ করিয়া নারী নির্যাতন ও রাক্ষসবাদ (শোষণবাদ) ধ্বংস করেন। সত্যযুগের ইন্দ্রাদি নেতাদের মতন ইনিও আশ্বিন মাসে মহাশক্তির উপাসনা করিয়া রাক্ষসবাদ ধ্বংস করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তোমরাও আঙ্গরিকতা, বর্বরতা, নারী নির্যাতন ও শোষণবাদকে ধ্বংস করিবার জন্য মহাশক্তির উপাসনায় সংঘবদ্ধ হইবে। ‘গায়ত্রী উপাসনা’ মহাশক্তিরই নিত্য কর্তব্য উপাসনা জানিবে।

**শ্রীবুদ্ধ।** ইনি ১৪ হইতে ১৫ কলায় বিকশিত ছিলেন। ১৫ কলায় বিকশিত থাকিবার দরুণ বৌদ্ধ ধর্ম একটু শান্তি প্রধান ধর্মে ঝুঁকিতে চেপ্টা করে। মানুষের চরিত্রবলকে ভিত্তি করিয়া সমাজ হইতে গুণ্ডামি ও বর্বরতা বহিষ্কারের আদর্শ স্থাপনায় ইনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইনি আমাদের সমাজে সবচেয়ে নিকটতম অবতার। ২৫০০ বৎসর পূর্বে এই মহাত্মার জন্ম হয়। ইহার জন্মের পর আমাদের দেশে আর অবতার কলার মহাপুরুষের জন্ম হয় নাই। যদি তোমরা কখনও প্রয়াগ বা কাশীতীরে গমন কর তবে দেখিতে পাইবে; পুরোহিত সংকল্প মন্ত্বে বলিতেছেন - “বিষ্ণু রো তৎসৎ অদ্য বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ.....শ্রীবুদ্ধাবতারে.....” ইত্যাদি। অর্থাৎ ইহা দ্বারা তোমরা দেখিতে পাইতেছ এটা বৌদ্ধাবতারের যুগ চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব পর্য্যন্ত সবটাই বুদ্ধ অবতারের যুগ। ইনি পৌরোহিত্যবাদ ও অহুঁতবাদ ভাঙ্গিয়া দিয়া এক স্কন্দর সাম্য সমাজের ভিত্তি দান করিয়াছিলেন। ইনি উপনিষদের জ্ঞান ও আদর্শময় জীবনকে অতি সহজ পন্থায় সমাজের সামনে স্থাপন করেন। উহা এখন ‘পঞ্চশীল’ ও ‘দশশীলের’ অনুশীলন নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মণ্যবাদের আড়ালে পৌরোহিত্যবাদ পুনঃ গজাইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু আজও পৌরোহিত্যবাদ ও অহুঁতবাদ ভাঙ্গিবার অনুকূলে জনমতের অভাব নাই। তোমরা এই সন্ধিক্ষণে বৌদ্ধ হিন্দুদের মত বেদকে ভিত্তি না করিয়া ভুল করিও না। বরং বেদই আমাদের সমাজ জীবনের প্রধান ভিত্তি। তোমরা বৈদিক কৃষ্টির যথেষ্ট চর্চা বৃদ্ধি করিবে। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাতে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। ঐদিন সমস্ত ভারতে ও পৃথিবীতে ধর্ম পূর্ণিমা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তোমরা ইহা অত্যন্ত আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিবে। কারণ ইনি এই যুগের অবতার। আমাদের দেশের অসহযোগ আন্দোলনের সময় এক অদ্ভুত ভ্রান্তি জাতীয় নেতাদের কার্য্যে প্রকাশ পায়। নেতাগণ সেই সময় গয়ার বুদ্ধ মন্দিরটি

বৌদ্ধ হিন্দুদের হাতে দিবার আন্দোলন করিতে থাকেন! এই ঘটনায় হিন্দুদের প্রাণে বিশেষ আঘাত দিতে নেতাগণ মোটেই ইতস্ততঃ করেন নাই। নেতাদের জীবন এবং শিক্ষাদীক্ষা পাশ্চাত্য আদর্শে গড়িয়া উঠিবার দরুণ তাঁহারা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট অজ্ঞতা দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের বহু কার্যে হিন্দু ধর্মের এবং ন্যায়ধর্মের বিপরীত আচরণ ফুটিয়া উঠিতে থাকে। গয়ার শ্রীবুদ্ধ মন্দির বিদেশীয় বৌদ্ধদের হাতে সপিয়া দিবার আন্দোলন উহাদের অন্যতম। নেতাজী স্তভাষ প্রবর্তিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্য কলাপ বৃদ্ধি হইবার পর দুর্বল নেতাদের চিন্তাবৃত্তি সংশোধিত হয়। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের শুভ লক্ষণ। তোমরা জানিয়া রাখিবে শ্রীবুদ্ধ আমাদের ১০ জন প্রধান অবতারের একজন। তিনি শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে একটুও কম পূজ্য বা কম প্রিয় নহেন। বুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান নেতা এবং প্রধান গুরু। রামের ধর্ম যেমন হিন্দুর ধর্ম বুদ্ধের ধর্মও তেমনই হিন্দুরই ধর্ম। প্রধান অবতারদের কথা বলা হইল। তোমরা ব্রহ্মস্ভোত্রে ও গায়ত্রী মন্ত্রে অবতার উপাসনার উপসংহার করিও। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে এইসব অবতার কলার মহাত্মাগণ একাধারে কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আদর্শ বিগ্রহ। ইহারা ব্রহ্ম কর্ম্মী এবং ব্রহ্মজ্ঞানী। ইহাদের চরিত্র আলোচনাও ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মকর্ম্মের সহায়ক। ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শাস্ত্র মাত্রেই আছে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর স্বভাব আমরা অবতার চরিত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। রামের চরিত্রে সাতকলার দৈবীভাব বেশী ছিল, বুদ্ধের চরিত্রে আটকলার ঋষিজন এবং যোগীজন অত্যন্ত আশ্চর্যরূপে প্রস্ফুটিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে শক্তিস্তরের ১৬ কলার কর্ম্ম-প্রতিভা নিখুঁতভাবে স্থান পাইয়াছিল। রাম রাজাধীশ, বুদ্ধ যোগীশ্বর, কৃষ্ণ পুরুষোত্তম বা ঈশ্বরতুল্য প্রতিভাসম্পন্ন। রাম হিন্দুদের সমাজ জীবনের হৃদয় কেন্দ্র, বুদ্ধ হিন্দুদের সমাজ জীবনের শিবপিণ্ড এবং কৃষ্ণ আমাদের সমাজ জীবনের ব্রহ্মনাড়ী স্বরূপ। এই পৃথিবীর বৃকে এই তিনটী চরিত্র আশ্চর্য্য সৃষ্টি।

রাম, বুদ্ধ ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া এই পৃথিবীতে যত লোক ধর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহাদের সংখ্যা এই পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তাহাদের অর্দ্ধেকের বেশী। শীঘ্রই পৃথিবীতে এমন দিন আসিবে যখন বৌদ্ধবাদ ও গীতার ধর্ম্ম সমস্ত মানুষের চিন্তা প্লাবিত হইয়া যাইবে। এবং সমস্ত অহিন্দু ধর্ম্মের দার্শনিকতা ‘মিথ্যা’ বলিয়া তিরস্কৃত হইবে। অধিক কি অহিন্দুরাও নিজ নিজ ধর্ম্মের দার্শনিকতা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিবে। এবং হিন্দু দার্শনিকতার নকল করিয়া মিথ্যুক ও কাফের হইতে লজ্জা বোধ করিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ও শ্রীবুদ্ধ আমাদের দেশে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। সৎ, চিং ও আনন্দ (অদ্বৈত তত্ত্বই আনন্দ) তত্ত্বই ব্রহ্মস্ভোত্রে বিদ্যমান। কাজেই অবতার উপাসনা তোমরা ব্রহ্মস্ভোত্রেই করিবে।

তোমরা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ও শ্রীবুদ্ধকে ব্রহ্মনাড়ীরূপেই জানিবে। সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রে ইহাদিগকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মস্ভোত্রে ব্রহ্মরূপ বলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায়ও বলিয়াছেন যে তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়স্থিত আত্মা বা ব্রহ্মনাড়ীতে অবস্থিত ব্রহ্ম।

যথা - অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এবচ ॥

হে অর্জুন, আমি সমস্ত জীবের অন্তরে অবস্থিত 'আত্মা'। আমি সমস্ত ভূতের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ।

এবার তোমাদের নিকট মহাপুরুষের উপাসনা সম্বন্ধে বলা যাইতেছে।

## মহাপুরুষ উপাসনা

আমাদের সমাজ অত্যন্ত প্রাচীন। কাজেই আমাদের দেশে যে সব মহাপুরুষ হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তাঁহাদের সংখ্যা এত বেশী যে শুধু নাম বলিলে এইরূপ ছোট একখানা পুস্তক হইয়া যাইবে। কয়েকজন মাত্র মহাপুরুষের নাম বলিব। ইহাদের মধ্যে কেহ জ্ঞানশক্তি প্রধান ছিলেন এবং কেহ কেহ ছিলেন কর্মশক্তি প্রধান। আমাদের দেশে মধ্যযুগে বহু ভাববাদী মহাত্মা হইয়া গিয়াছেন।

স্বয়ম্ভুব মনু, সপ্তঋষি (যথা - কশ্যপ, অত্রি, গৌতম, ভরদ্বাজ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ), ৪ জন কৌমার্য ব্রতধারী ঋষি (সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার), ব্যাস জৈমিনী, গৌতম, পাণিনি, পতঞ্জলি, কপিল, মহারাজ হরিশচন্দ্র, ভরত, লক্ষণ, মহাবীর হনুমান, মহারাজ শিবী, যযাতি, ভীষ্ম, কর্ণ, অর্জুন, গুরুগোবিন্দ, প্রতাপসিংহ, শিবাজী, স্বামী দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি। ইহাদের প্রত্যেকটি জীবন হইতে আমরা অতি সামান্য কথায় বৃহৎ বৃহৎ রত্ন সংগ্রহ করিব। আমাদের দেশের মধ্যে দুর্বল স্তরের চিন্তা ও কর্মে বিশ্বাসী অনেক মহাত্মা হইয়া গিয়াছেন। আমরা তাহাদের জীবন আলোচনা করিবার প্রয়োজন মনে করি না। আমরা ঐসব মহাত্মাগণকেও অশ্রদ্ধা করি না।

**স্বয়ম্ভুব মনু।** ইনি আমাদের এই হিন্দু সমাজের প্রথম প্রবর্তক। ইনি এই সমাজকে একটা শক্তিশালী এবং দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনা করেন। এই সমাজের উপর দিয়া নানায়ুগে নানাপ্রকার উত্থান পতন হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শত বিপ্লবের মধ্য দিয়া আসিয়াও এই সমাজ আজও বাঁচিয়া আছে। অনুপযুক্ত পরিচালকের অদূরদর্শিতায়, পুরোহিতদের স্বার্থপরতায় এবং দুর্বল স্তরের সাধুদের ভাবধর্মের প্রাবল্যে আজ আমাদের অনেক দুর্দশা সহ করিতে হইতেছে। শীঘ্রই একদিন এমন আসিতেছে যে দিন এই সমাজের একটা শক্তিশালী সংস্কার আসিবে। কারণ স্বয়ম্ভুবের সেই শক্তিশালী চিন্তা এখনও লুপ্ত হয় নাই। স্বয়ম্ভুব ১৪ জন মনুর প্রথম মনু। ১৪ জন মনুর মন্বন্তর গত হইলে একটা মহাপ্রলয় হয়। এখন সার্বর্গি মনুর মন্বন্তর চলিতেছে। তোমরা পুরাণে এসব কথা জানিতে পারিবে।

আমাদের দেশের সমাজ সংস্কারের চিন্তাধারা ও পশ্চিমের চিন্তাধারা ও কর্মধারা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকারের। পশ্চিমের ডেমোক্রেশী, সোসিয়ালিজম্ (কমিউনিজম্) ও ফ্যাসিজম্-এর নাম তোমরা শুনিয়াছ। এসব সমাজ ব্যবস্থা স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষবাদ প্রধান হইয়া দাঁড়াইতেছে। ১০০ বৎসরের মধ্যেই ডেমোক্রেশীর যৌবনকাল শেষ হইয়াছে। উহার পর সোসিয়ালিজম্‌এর জন্ম হয়। এই সোসিয়ালিজম্‌কে শীঘ্রই বৃদ্ধাবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ফ্যাসিজম্ এই দুইটির মধ্যে একটু যুক্তি সম্মত হইলেও উহাও আঙ্গুরিক বিধান। এই সব আঙ্গুরিক বিধান হইবার দরুণ ইহাদের প্রত্যেকটির আয়ু কম।

কোন সমাজ বা সংগঠনের বিজ্ঞানেই বর্ধরতা, বিদেষ ও অত্যাচারকে কেন্দ্র করিলে উহার ফল ভাল হয় না। কখনও আঙ্গরিক সমাজ ব্যবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। স্বয়ম্ভুব প্রবর্তিত হিন্দু সমাজ এত দীর্ঘকালস্থায়ী হইবার ইহাই কারণ যে ইহার ভিত্তিতে শক্তিশালী যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত। ইহা যে আজ দুর্দশাগ্রস্ত, ইহার কারণ ইহাতে পৌরোহিত্যবাদ ও ভাববাদের পরগাছা জমিয়াছে। ইহার সংস্কার হইলে ইহা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী সমাজে পরিণত হইবে। তোমরা ইহার আবশ্যিক সংস্কারের সহায়ক হইও।

**সপ্ত ঋষি।** তোমরা গীতা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে - “মহর্ষয়ঃ সপ্তপূর্বে চত্বারো মনবস্তথা। মন্ডাভামানসা জাতা যেসাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ” ॥ ১০/৬ ॥ অর্থাৎ সাতজন ঋষি এবং চারজন মনু ইহারা আত্মার মানস সৃষ্টি এবং সকল প্রজাই এই ঋষি ও মনুদের সন্তান। তোমরা পিতৃপক্ষে গঙ্গা বা জলাশয়ের ঘাটে পিতৃপুরুষের তর্পণ করিতে দেখিয়া থাকিবে। মহালয়ার পূর্ববর্তী এক পক্ষ কালকে পিতৃপক্ষ বলে। এই পক্ষের নবমীকে মাতৃ নবমী বলে। ইহা মাতৃপূজার দিন। পূর্বপুরুষদের স্মরণ করিবার জন্য পিতৃপক্ষের অনুষ্ঠান হয়। তোমরা জানিয়া রাখিবে আমাদের সমাজজীবন অমর। আমাদের আত্মা বা অধ্যাত্ম জীবনও অমর। আমাদের শরীরটা বেশীদিন থাকে না। ইহা সাধারণতঃ ১০০ বছরের মধ্যে নষ্ট হয় এবং অণু পরমাণুতে মিলিয়া যায়। আমরা যদি এই সামান্য দিনের জীবনের কথা বেশী ভাবি এবং সমাজজীবনের কথা গ্রাহ্য না করি তবে জ্ঞানিগণ আমাদের মূর্খ ও স্বার্থপর বলিয়া তিরস্কার করেন। সমাজ কি বিজ্ঞানে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কিরূপ স্কন্দর ও চিরসত্য বিজ্ঞানে আজও দাঁড়াইয়া আছে উহা বুঝিবার জন্য আবশ্যিক সব কথাই তর্পণে আছে। একজন দার্শনিক জ্ঞানী অনেক গবেষণা ও বিদ্যাচর্চা দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন তর্পণে সেই সব কথাই আছে।

ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বসংসার এবং তুমি-আমি সবই উৎপন্ন হইয়াছি। ব্রহ্ম হইতে সোজা কেহ সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি হইবার নিয়ম আছে। এজন্য ব্রহ্মস্বর (শক্তিস্বর), তাহার পর রুদ্রস্বর (শিব স্বর), তাহার পর বিষ্ণুস্বর (বা হিরণ্য গর্ভ), ইহার পর প্রজাপতি (ব্যাপক মন), ইহার পর মানস পুত্র সপ্তঋষি ও মনুগণ এবং তাহাদের হইতে আমাদের সকলের পূর্বপুরুষগণ সৃষ্টি হইয়া পরে আমরা সৃষ্টি হইয়াছি। আমাদের সমাজ অর্থে সাম্রাজ্যবাদ ও কম্যুনিষ্টদের মত ঝগড়া করিবার বা বর্ধরতা করিবার সমাজ নহে। আমাদের সমাজ একদল মানুষকে কাফের বা বিধর্মী কল্পনা করিয়া লইয়া তাহাদের উপর বর্ধর অনুষ্ঠানেরও সমাজ নহে। আমাদের সমাজ অর্থে ব্রহ্মস্বর হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্কুল বিশ্ব এবং ব্রহ্মস্বর হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্কুল বিশ্বে যত প্রকার জীব আছে সকলের সমষ্টি এবং এই সমষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের উপর আমাদের যে কর্তব্য এবং এক সমাজ-বোধক নিয়ম ইহাই আমাদের সমাজ। সমাজ গঠনের এমন মহান বিজ্ঞান ও মহান আদর্শ আর হইতে পারে না। পৌরোহিত্যবাদ ও ভাববাদ দেখিয়া বিচলিত হইও না। ভুল ভ্রান্তি সব মানুষেরই হয়; আবার সংশোধনও মানুষই করে। এমন অমর চিরসত্য সমাজে জন্ম হইয়া আমরা ধন্য। এই চিরসত্য সমাজকে উপেক্ষা করিবার জন্য যাহারা ভ্রান্ত ও পরিকল্পিত সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদেরও ভ্রান্তি

কাটিবে। ২০০০ বৎসর পূর্বে যে সমাজের অস্তিত্ব নাই, ১৪০০ বৎসর পূর্বে যে সমাজের অস্তিত্ব ছিল না সেই সমাজ যে ২, ৫ শত বৎসরের মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে না ইহা কে জোর করিয়া বলিতে পারে ? জানিয়া রাখিবে যার আরম্ভ আছে উহার শেষও আছে। কিন্তু যাহার আরম্ভ অনন্ত ব্রহ্মে তাহার শেষও অনন্ত ব্রহ্মে। অর্থাৎ সেই সমাজ ব্রহ্মেরই মত অনাদি ও অনন্ত। যাহা হউক ব্রহ্ম, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতি, সপ্ত ঋষি, পিতৃপুরুষ, মাতৃপুরুষ, বাস্কব, অবাস্কব, মহাপুরুষ, গন্ধর্ব্ব, বনস্পতি ও বিশ্বজগতের সকলের উপর আমাদের কর্তব্য এবং এক সমাজবোধকে জাগ্রত করিবার জন্য তর্পণ (তৃপ্তি বিধান) যজ্ঞ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিও আমাদের জীবন শুধু মানব সমাজকে লইয়াই নহে, এমন ব্যাপক সমাজ-বোধক সমাজ এই পৃথিবীতে আর হয় নাই এবং হইবে না। এমন ব্যাপক সমাজ-বোধক সমাজবিজ্ঞান গঠিত হইলেও তোমরা আশ্চর্য্য হইবে যে হিন্দু সমাজের কোন শক্তিশালী মহাত্মাই আঙ্গরিক নীতিতে পরিচালিত সমাজকে সহ্য করিবার নির্দেশ দেন নাই। কারণ উহারাই সমাজ জীবনের শত্রু। উহার কাল্পনিক ধর্ম্ম, কাল্পনিক সমাজ, কাল্পনিক রাষ্ট্র গড়িয়া সমাজ জীবনের স্তম্ভ নষ্ট করিয়া থাকে।

বৃত্তি ও কর্ম্ম ব্যবস্থায় আমাদের সমাজের বর্ণভেদ থাকিলেও পিতৃপক্ষে সকলেই সমবেতভাবে পিতৃ তর্পণ বা পিতৃ উপাসনায় একত্র হয়। প্রত্যেকেই জানে তাহার গোত্র কি ? এবং দেখা যাইবে কোন না কোন ঋষি হইতে তাহার বংশের উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের কেবল পিতাই নহেন, তাঁহারা আমাদের গুরু, আমাদের শিক্ষক এবং আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের প্রবর্তক। তাঁহারা আমাদের দেশের অগুণরমাণুকে পবিত্র করিয়া দেশকে অত্যন্ত প্রিয় ও পূজ্য করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মকে, সমাজকে, দেশকে কিরূপ ভালোবাসিতেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম কিরূপ ন্যায়পরায়ণতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা তোমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারিবে। বেদ ঋষিগণেরই তপস্যালঙ্কার জ্ঞান বা অনুভূতির সংগ্রহ গ্রন্থ। আত্মা যে জীবমাত্রের অমর সত্ত্বা ইহাও ঋষিগণই অনুভব করিয়াছিলেন। ঋষি, বেদ এবং আত্মাকে ভিত্তি করিয়া আমাদের সমাজ অনন্তকাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া উচ্চশিরে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

অনেকে সমাজের সমস্ত শাখায় অন্তর্চলন প্রচলিত না থাকাটাকে সমাজজীবনের বিশেষ আবর্জনা মনে করে। তোমরা ঈশব লইয়া হট্টগোল করিও না। উচ্চ বৈজ্ঞানিক বৈদিক আচার ধর্ম্ম সমস্ত শাখায় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। বহুদিন ধরিয়া বংশগতভাবে আচারধর্ম্মের অনুশীলন হইবার দরুণ, সমাজের সমস্ত শাখায় একই আচার ও নিয়ম প্রবর্তিত নাই। কাজেই অন্তর্চলন ও বিবাহ নিয়মকে কিছুতেই ব্যাপক করা সম্ভব নহে। কাহারও ইচ্ছার বা ধর্ম্মসংস্কারের বিরুদ্ধে কাহারও হাঁড়িতে অন্তর্ গ্রহণে বাধ্য করা 'বর্বরতা'র অনুষ্ঠান জানিবে। তবে ধর্ম্মস্থানে ও মন্দিরে ছুঁতমার্গ, আইন করিয়াই ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। লক্ষ লক্ষ বৎসরের অনুষ্ঠিত সমাজধর্ম্মের উচ্চ বৈশিষ্ট্যকে আমরা কিছুতেই অশ্রদ্ধা করিতে পারিব না। বরং আমরা উহাকে শ্রদ্ধা করিব। আমরা জানি সৃষ্টির ক্রমে ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতি বিদ্যমান। পরে সপ্ত ঋষি ও চার মনুকে কেন্দ্র করিয়া মানব সৃষ্টি। বর্বর হইয়া সমাজ ভাঙ্গা বা সমাজ গড়া আমরা সমর্থন করি না।

সৃষ্টির এই নিয়ম সম্বন্ধে পৌরোহিত্যবাদিগণকে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিতে দেখা গিয়াছে। কাজেই সেই সম্বন্ধেও বলা যাইতেছে -

ॐ ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह राजन्यःकृतः ॥

উরুতদস্য যদৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শুদ্রোহ জায়ত ॥ যজুর্বেদ ॥ পুরুষসূক্তম্ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞানী) তাঁহার মুখস্বরূপ, ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা ও শাসক) তাঁহার বাহুস্বরূপ, বৈশ্য (ব্যাপারী, পশুপালক ও কৃষকগণ) তাঁহার উরুস্বরূপ এবং শূদ্র (মজুর শ্রেণী) তাঁহার পদ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

দ্রাস্তব্য ব্যাখ্যাতাগণ বলিয়া থাকেন - “হঁা ইহা সত্য যে একই পরমাঙ্গা হইতে সব শ্রেণীর মানব সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সকলেই এক অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কাজেই সকলেই একই ঋষির বংশধর নহে।”

আমরা তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বেদ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা বলিতে পারি - তাঁহার মুখ, হাত, পা বলিয়া কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই। তিনি ব্যাপক। সমাজজীবনের বিভিন্ন কর্ম বিভাগকে একই পরমপুরুষের চার প্রকার নিয়ম বুঝানো ভিন্ন, মন্তের কদর্থ করা অন্যায। প্রমাণ যথা -

ॐ বিশ্বতচক্ষুরত বিশ্বতোমুখ বিশ্বতোবাহুরত বিশ্বতস্পাৎ ।

সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপত্রে দ্যাভা ভূমিৎ জনয়ন্দেব একঃ ॥

যজু অঃ ১৭। মং ১৯ ॥

“তিনি একমাত্র পরমাঙ্গা তিনি বিশ্বতচক্ষু, বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতোবাহু, বিশ্বতোপাদ অর্থাৎ তাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু, পা, সবই ব্যাপক। তিনি ঐরূপ ব্যাপক বাহুদ্বারা উড়নশীল পরমাণু দ্বারা দৈবলোক ও পৃথিবীকে উৎপন্ন করেন।”

তাঁহার মুখ বাহু যদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইত, তবে ব্রাহ্মণদের চেহারাটিতে নারায়ণ শিলার মত একটা মুখ মাত্র হা করিয়া থাকিত এবং তাহাদের অন্য অঙ্গ থাকিত না। ক্ষত্রিয়দের চেহারা একটা বেড়ীর (হাঁড়িধরা) মত হইত। বৈশ্যরা হইত এক একটি যাঁতীর মত। শূদ্ররা হইত এক একটি সাঁড়াশীর মত। ঠিক ঠিক মানুষের আকার কেহই পাইত না।

তাঁহার পাণিপাদগুলি কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্র। পরমাণু কণাগুলি কিরূপে এই বায়ুমন্ডলে ব্যাপ্ত, উহার আভাষ তোমরা গৃহ মধ্যে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ স্থানে দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইবে, পরমাণু কণাগুলি স্বাধীন ভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে। এই কণাগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে একত্রিত হইয়া এই পৃথিবী ও গ্রহ নক্ষত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা তোমরা বৈশেষিক দর্শনে দেখিতে পাইবে।

বেদের কদর্থ করিয়া কোন লাভ নাই। কারণ কদর্থের সামঞ্জস্য করা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি কর্ম নিয়মের চার প্রকার ভেদ। ইহা পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমাজেই বর্তমান।

গীতায়ও ব্রহ্মলক্ষণ বর্ণনা অংশে ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে। যথা -

সর্বতঃপাণি পাদন্তং সর্বতোহক্ষিণিরোমুখং ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ গীতা ১৩-১৪

সেই ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাপক পাণি, ব্যাপক পদ, তিনি ব্যাপক শির, অক্ষি ও ব্যাপক মুখ স্বরূপ। তাঁহার শ্রুতিও ব্যাপক। তিনি সর্বকে আবরিত করিয়া অবস্থিত ॥ অর্থাৎ ব্রহ্ম

তত্ত্ব ব্যাপক, তাঁহাতে নানা প্রকার নিয়মগুলি ব্যাপক ভাবেই বিদ্যমান। সেইসব নিয়মগুলিই পাণিপাদ স্বরূপ।

তর্পণ বিধানে ব্রহ্ম, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতি ও সপ্ত ঋষি বিভিন্ন শ্রেণীর জন্ম বা বিভিন্ন বর্ণের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব বা ব্যক্তি নহেন।

সৃষ্টির মূলে একই ব্রহ্মতত্ত্ব ও সপ্তঋষি হইলেও আমাদের বংশ পরম্পরাতে আচার-ধর্মের যে যথেষ্ট ভেদ বিদ্যমান ইহা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন দেখি না। ইংরেজ জার্মানীরা একপাতে খায় এবং বিবাহ আদিও করে, তবুও ঝগড়ার শেষ নাই। কিন্তু আমাদের দেশে এক পাতে না খাইলেও উচ্চ বর্ণে ও অনুন্নত বর্ণে কস্মিনকালেও ঝগড়া বিবাদ হয় নাই।

এদিকে ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস প্রবর্তকগণ আমাদের দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া লিখিয়াছেন। তাহাদের মতে আর্য্যগণ মধ্য এশিয়া হইতে এদেশে আসিয়া আদিম অধিবাসীগণকে অর্ছত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা ইহা স্বীকার করি না। আমরা জানি সপ্তঋষি হইতে মানুষ মাত্রেই জন্ম। এই সপ্তঋষি কোন স্তপ্রাচীন যুগে আমাদের দেশেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে নানা আকারের মাথার কঙ্কাল বিশিষ্ট মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা এক এক ঋষির বংশধর। পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, কোচ, দ্রাবিড়ীরা মাথার কঙ্কাল বিভিন্ন হইবার কারণ বিভিন্ন প্রকারের ঋষিসন্তান বলিয়া। ঋষিসন্তানগণ এখান হইতে ধীরে ধীরে পৃথিবীর সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তোমরা যদি একটু অন্তর দৃষ্টি লইয়া বিচার কর, তবে দেখিতে পাইবে এখান হইতেই মানব সভ্যতার মূলধারা ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে এবং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ সব দেশের লোকগুলিকে দেখ; দেখিতে পাইবে সবই এই দেশেরই এক এক প্রান্তের লোকদের বংশধরগণ দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া রহিয়াছে। আবার খুব প্রাচীন সভ্যতার আলোচনা কর দেখিতে পাইবে এখান হইতেই সব সভ্যতা ধীরে ধীরে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমাদের হইতে যতদূর যাইবে সভ্যতা ততই ক্ষীণ দেখিতে পাইবে।

তোমরা প্রশ্ন করিতে পার তবে এইসব অনুন্নতরা কে ?

উঃ। প্রথম কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ হয়। পরে বংশ পরম্পরাতে বর্ণ ও কর্ম্মভেদ অনেকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্ত্তী যুগে সর্বর্ণ বিবাহ শ্রেষ্ঠ বিবাহ এবং অসর্বর্ণ বিবাহ উহা হইতে অপকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া মানা হয় এবং বিলোম বিবাহ নিকৃষ্ট বিবাহ বিবাহ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। হীন বর্ণের সন্তানগণ উচ্চবর্ণের কন্যাগণকে বিবাহ করিলে উহাকে নিকৃষ্ট বিবাহ বলা হইত। এইরূপ বিবাহের ফলে যে সন্তান হইত তাহারা অনুন্নত বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এই সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

যে সময় বর্ণধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় সেই সময় মহারাজ স্বয়ম্ভুব মনুর রাজত্বকাল ছিল। সেই সময় তাঁহার রাজত্ব সীমার মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র শাসক ছিলেন, যাঁহারা বর্ণধর্ম্ম মানিতেন না। এইজন্য তাঁহাদের প্রজাদের মধ্যে বর্ণধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পরবর্ত্তী যুগে এইসব সমাজ অংশকেও অনুন্নতদের মধ্যে ধরা হয়। এমন সময় আসিবে যখন এক জোর আন্দোলন আসিয়া আমাদের শিক্ষার মধ্যস্থিত ইংরেজ প্রবর্ত্তিত মিথ্যা ও কল্পিত

ইতিহাস ভাঙ্গিয়া দিবে। কারণ এইরূপ মিথ্যা ইতিহাস আমাদের সমাজজীবনকে অকারণ কলুষিত করিতেছে এবং সমাজ গঠনের অন্তরায় হইতেছে।

**ব্যাসদেব।** আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাকে ব্যাস পূর্ণিমা বলে। এই পূর্ণিমাতে সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজকগণ ভ্রমণ শেষ করিয়া একস্থানে (গুরুর নিকট) অবস্থান করিয়া শাস্ত্র আলোচনা ও সাধনা করিয়া থাকেন। এই পূর্ণিমাতে হিন্দুধর্মের সমস্ত শাখার আচার্য্যগণের (বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, ব্যাকরণ, ন্যায় ইত্যাদি) পূজা উৎসবাদি হইয়া থাকে। আমরা বর্তমানে যে সব প্রধান প্রধান হিন্দু ধর্মশাস্ত্র দেখিতে পাই, উহার একটা বৃহৎ অংশ ব্যাসের সংকলিত। ইনিই বেদের মন্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চার ভাবে ভাগ করিয়াছেন। যাহাতে বেদের পঠন পাঠন ভালভাবে চলিতে পারে এজন্য তিনি ইহার আরও শাখা বিভাগ করেন। বিভিন্ন আচার্য্যের টোলেতে উহাদের পাঠের ব্যাবস্থা করিয়া দেন। তোমরা বেদান্ত সূত্রের নাম শুনিয়াছ। এই বেদান্ত সূত্র ব্যাসদেবের লিখিত গ্রন্থ। আচার্য্য শঙ্কর এই বেদান্ত সূত্রের অদ্বৈত-বাদ ব্যাখ্যা করেন।

**জৈমিনী।** ইনি কর্ম্মমীমাংসা দর্শন রচনা করেন। বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড কিভাবে সম্পন্ন হইবে এই সম্বন্ধে এই দর্শন শাস্ত্রখানা রচিত। বেদের জ্ঞান ভাগ (উপনিষদ্) এর সূত্রকারক মহর্ষি ব্যাস। উহারই নাম 'বেদান্তদর্শন'। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিধান মহর্ষি জৈমিনী প্রবর্ত্তন করেন। অনেকের ধারণা এই দর্শনশাস্ত্রখানাই আমাদের দেশে পৌরোহিত্যবাদের প্রবর্ত্তনের হেতু হইয়াছিল। বৃদ্ধদেব এই যজ্ঞভাগকে অহিংসার নামে বেশ ভালোভাবে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন; যে কারণে পৌরোহিত্যবাদিগণ বৌদ্ধগণকে নাস্তিকবাদী বলিয়া বদনাম করিতেন। বঙ্গদেশের ঝাড়ের সময় 'জৈমিনীর' নাম উচ্চারণ করিতে শুনা যায়। যজ্ঞ দ্বারা দৈবজগৎ তৃপ্ত হন। ঝড় ও বজ্রপাতকে দৈব দুর্বিপাক বলা হয়। জৈমিনী যজ্ঞবিধানের প্রবর্ত্তক।

**মহর্ষি গৌতম।** ইনি ন্যায় দর্শনের রচয়িতা। ইহা অতীব স্কন্দর দর্শন। ইহার অন্য নাম তর্কশাস্ত্র (Logic)। কাশী ও নবদ্বীপে ন্যায়ের বিশেষ চর্চা হইয়া থাকে।

**মহর্ষি কণাদ।** ইনি বৈশেষিক দর্শনের রচয়িতা। ইহাকে পরমাণুবাদ বলে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ইদানীং যে সব দর্শন শাস্ত্র লিখিয়াছেন সেই সব দর্শন শাস্ত্র বৈশেষিক ভিত্তিতে লিখিত।

**মহর্ষি কপিল।** ইনি বঙ্গদেশের পাদদেশে সাগর সঙ্গমে অবস্থান করিতেন। এখনও পৌষ সংক্রান্তির দিন এই মহামুনির আশ্রম দেখিবার জন্য প্রকাণ্ড সন্মিলন হইয়া থাকে। সাংখ্য দর্শনের ইনি বক্তা। ইহাকে আদিজ্ঞানী বলা হয়। সমস্ত হিন্দুদর্শনের চাবি সাংখ্য দর্শন। মহারাজ সগরের সন্তানগণ অত্যন্ত আশ্রয়িত হইয়া অত্যন্ত কুকার্য্য আরম্ভ করিলে মহর্ষি তাহাদিগকে শাপ দিয়া ধ্বংস করেন। ইনি তন্ত্র শাস্ত্রের একজন বিখ্যাত প্রবর্ত্তক।

**মহর্ষি পতঞ্জলি।** ইনি যোগদর্শনের রচয়িতা। ইহা মনোবিজ্ঞানের ও যোগবিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন। এই দর্শনের কোথাও একটু খুঁত নাই। ইহা পাঠ করিবার পর তোমরা বুঝিতে পারিবে - 'হিন্দুধর্ম্ম' একটি বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম।

**মহর্ষি পাণিনি।** ইনি পাণিনি ব্যাকরণের রচয়িতা। ইহাও একখানা দার্শনিক গ্রন্থ। ইহা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ। আমাদের দেশের প্রায় সব প্রাদেশিক ভাষারই বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণগুলি পাণিনির ভিত্তিতে লিখিত।

**মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য।** তোমরা যখন বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ বা উপনিষদ্‌ ভাগ পাঠ করিবে তখন দেখিতে পাইবে, কৃষ্ণ ও শূক্ৰ দুইপ্রকার যজুর্বেদের নাম আসিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদ শাখার একজন আচার্য্য ছিলেন। ইনি ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। ইনি অত্যন্ত উগ্রতপা মহাত্মা ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ ইনি ব্যাসের নিকট অন্য গুরুভাইগণকে হীনবীর্য্য বলেন। ইহাতে ব্যাস রুষ্ট হন। ইনি বেদ ত্যাগ করিতে আদিষ্ট হন। উহা ত্যাগ করিবার পর ইনি অত্যন্ত স্ত্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। বেদহীন জীবন তাঁহার নিকট তুচ্ছ মনে হইতে থাকে। তিনি তপস্যা দ্বারা বেদ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হন এবং সক্ষম হন। তিনি যাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন উহার নাম কৃষ্ণ যজুর্বেদ এবং তিনি স্বীয় প্রতিভা ও তপস্যা দ্বারা যাহা আয়ত্ত করিয়াছিলেন সেই বিরাট গ্রন্থের নাম শূক্ৰ যজুর্বেদ। এই মহাতপা মহর্ষির কথা ভাবিলে বাস্তবিক শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া যায়। ইঁহার জীবন আমাদেরকে ভালভাবেই শিক্ষা দেয় - ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, একনিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও উন্নত লক্ষ্য থাকিলে মানুষ যে কোন জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে।

**সিদ্ধনাগাজ্জুন।** ইনি অতীব শক্তিশালী একজন তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। ইঁহার প্রণীত রসায়ন শাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্র আছে।

**মহারাজ হরিশচন্দ্র।** তোমরা কাশীতে হরিশচন্দ্র ঘাট দেখিতে পাইবে। মহারাজা এই ঘাটে ডোমের কৃতদাস হইয়া মৃতের শুষ্ক আদায় করিতেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে ইনি নিজের সমস্ত রাজ্য দান করেন। সব দান হইয়া যাইবার দরুণ দক্ষিণার অর্থ তাঁহার ছিল না। তিনি ডোমের ক্রীতদাস হইয়া দক্ষিণার অর্থ সংগ্রহ করেন। এই ঘটনার পর তাঁহার রাণী শৈব্যা এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাসী বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একমাত্র সন্তান রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণের পুত্র চয়ন করিত। একদিন রোহিতাশ্ব পুত্র চয়ন করিতে যাইয়া সর্পাঘাতে মারা যায়। অর্থহীনা অসহায়া শৈব্যা সেই মৃত বালককে লইয়া সংকার করিতে অন্ধকার রাত্রিতে এই ঘাটে একাকী আসেন এবং শুষ্কের অর্থ ছাড়িয়া দিবার জন্য ডোমের বেশধারী স্বামীকে অনুনয় বিনয় করিতে থাকেন। এই ঘটনায় ঐ ব্রাহ্মণের মনোবিজ্ঞানের যে নীচ ও হীন ছবি প্রকাশ পাইয়াছে এবং যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং যেরূপ ত্যাগ ও বিনয় ভাব শৈব্যাতে প্রকাশ পাইয়াছে উহা রামায়ণে দেখিয়া তোমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। এই ঘটনার মত শত শত ঘটনা আমাদের সমাজে নিত্য আসিতেছে। তোমরা কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণের মত মনোবৃত্তি সব সময়ই ত্যাগ করিও।

এই মর্মস্পর্শী ঘটনার পর হরিশচন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের জীবনের পরীক্ষা শেষ হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বালকের জীবন দান করিয়া তাঁহাদের রাজ্য দান করিলেন।

বিজ্রমপুরে (ঢাকা) রামপালের নিকটে একটি পুকুরের মত স্থান আছে (স্বথবাসপুরের নিকট)। উহা বারমাস জলজ ঘাসে এমনভাবে আচ্ছন্ন থাকে যে উপরে মানুষ ও পশুগণ বেড়াইলেও দাম টলে না। কিন্তু মাঘী পূর্ণিমার দিন যদি তুমি ঐ পুকুরের ধারে যাও, দেখিতে পাইবে দামগুলি সবই ডুবিয়া গিয়াছে এবং পুকুরে নির্মল জল রহিয়াছে।

কিংবদন্তী আছে যে মহারাজ হরিশচন্দ্র এই স্থানে মাঘী পূর্ণিমায় একটি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পুকুরটা তাঁহারই যজ্ঞকুণ্ড ছিল। (মহারাজ হরিশচন্দ্র ঐখানে যাইয়া কেন যজ্ঞ করিলেন ইহা বুঝা যায় না। মনে হয় ইহা বঙ্গদেশীয় কোন পুণ্যপ্রতাপী রাজার যজ্ঞ কুণ্ড।) প্রতি বৎসর সত্যযুগ উৎপত্তির দিনে ঐ পুকুরটি ধার্মিক রাজার নির্মল স্নেহে প্রজাপালনের স্মৃতি দেখাইতেছে। সেই নির্মল ও পবিত্র দৃশ্যের কথা ভাব, আবার কাশী হরিশচন্দ্র ঘাটের ঐ পবিত্র স্মৃতি স্মরণ কর। কাশীর বৃকের উপর ঔরঙ্গজেবের কুকীর্তি বিশ্বনাথ মন্দিরের দুর্দশার দৃশ্যও রহিয়াছে। বর্বরতার স্মৃতি ও ধর্ম প্রতাপের স্মৃতি যখন যুগপৎ তোমার মনে জাগিবে তখন তুমি নিশ্চয় জানিবে এক মহান জাতির মহান আদর্শের কোলে জন্ম লইয়া ‘আমি ধন্য’।

**মহাবীর হনুমান।** রামায়ণে এই মহাবীরের কথা জানিতে পারিবে। অনেক মন্দিরে হনুমানের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোর্মার্যব্রতে ইনি মূর্তিমান্ দেবতা। নারীর উপর এই বীর পুরুষের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। মূর্তিতে দেখিতে পাইবে ইহার একহস্তে গদা ও অন্য হস্তে পাহাড়খণ্ড রহিয়াছে। এই ভাবে তিনি নারীর মর্যাদা নষ্টকারী রাবণের প্রতি ধাবমান। ব্রহ্মচর্য্য জীবন বা শিক্ষা জীবনের ইহা এক বড় আদর্শ যে ব্যায়াম দ্বারা শরীর দৃঢ় করিতে হইবে, নারীমাত্রকে মাতৃবুদ্ধিতে শ্রদ্ধা করিতে হইবে এবং নারীর মর্যাদা নষ্টকারীকে কঠোর দণ্ড দিতে হইবে। আমাদের দেশে এখন একদল মাতৃবর গজাইয়াছেন যাঁহারা স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থন করিতে লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা জানিয়া রাখিবে স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খল হওয়া নয়।

অনেকে হনুমানের সমুদ্র পার হইয়া যাওয়ার ঘটনাকে কল্পিত মনে করে; কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখিবে উহা মোটেই কল্পিত ঘটনা নহে। এক সত্য ঘটনা বলা যাইতেছে - কাশীতে বরুণা নদীর তটে প্রতি বৎসর এক রামলীলা হইয়া থাকে। সেখানে ভরতমিলনের দিন রাম, লক্ষণ, সীতা ও হনুমানের বেশধারীগণকে জনসাধারণের দিক হইতে মালা ও ফুলাদি দ্বারা পূজা করিতে দেখিয়া উপস্থিত এক ইংরেজ সব ডিভিসনেল অফিসার একটু বিস্মিত হন। তিনি সেখানে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব লইয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকটস্থ এক পরিচিত স্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ইংরেজ বলেন, “হনুমানের লাফ দিয়া সাগর পার হওয়ার ঘটনা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। এভাবে মানুষকে রাম, লক্ষণ, সীতা ও হনুমান সাজাইয়া পূজাও যুক্তিযুক্ত প্রথা নহে।” ভদ্রলোক বলিলেন আমাদের এখানে লোকের বিশ্বাস যে রাম, লক্ষণ, সীতা ও হনুমানের আত্মা এসব কল্পিত ব্যক্তিতে আবিষ্ট হন। ইংরেজ বলিলেন - যদি আমি দেখিতে পাই এই হনুমান (বেশধারী) এক লাফে এই বরুণা নদী পার হইয়া ওপার গিয়াছে তবে মানি যে সত্যই হনুমান সাগর পার হইয়াছিলেন এবং হনুমান ইহাতে আবিষ্ট হইয়াছেন। বেশধারী হনুমান সব কথাই শুনিতো ছিলেন। তিনি ইহা শুনিবা মাত্র চীৎকার করিয়া “মহারাজ রামচন্দ্রজী কী জয়” বলেন এবং জনতাও উহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠে। ইহা হইবার সঙ্গে সঙ্গে হনুমান এক লাফে বরুণার অপর পাড়ে এক বৃক্ষে গিয়া বসেন। জনতায় ভীষণ জয়ধ্বনি উঠিতে থাকে। হনুমান ঐ ভাবে ঐ বৃক্ষে অবস্থান করিয়া সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। এখনও

সেই মহাবীরের সমাধি সেখানে আছে। কাশীর বড় গণেশ (মহল্লা) নামক স্থানে এক মন্দিরে এখনও সেই হনুমানের সাজসজ্জা অত্যন্ত যত্নে ও পবিত্রভাবে রক্ষিত আছে। ইহা প্রায় ৮০/৮২ বৎসরের ঘটনা। ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ, ভক্তি ও অস্বরনাশের আদর্শ গ্রহণ করিয়া কিরূপ মহান ও শক্তিশালী হইতে পারে, হনুমান চরিত্রে তাহা যথেষ্ট ভাবে বিদ্যমান। এইরূপ কৰ্ম্মী মহাত্মা এই পৃথিবীতে ২/১ জনই জন্মায়।

**মহারাজ শিবি।** উশীনর নন্দন শিবি একদিন সভায় বসিয়া আছেন; এমন সময় এক ভয়ভীত কপোত তাঁহার কোলে আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ মধ্যে এক বাজও আসিল। বাজ বলিল, এ কপোত আমার বিধিদত্ত আহার, ইহাকে ছাড়িয়া দিন। রাজা বলিলেন, এ আমার আশ্রিত; তুমি অন্য আহার দেখ। বাজ বলিল, এ আমার প্রাকৃতিক খাদ্য; ইহাতে আপনি কিছুতেই বাধা দিতে পারেন না। রাজা অন্য আহার্য্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বাজ কপোতের ওজনে রাজার মাংস প্রার্থনা করিল, ইহাতে জুঁক হইয়া মল্লীগণ উহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। রাজা বলিলেন - “আপনারা থামুন। ছোট ঘটনাকেও রাজার উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। রাজা যদি ছোট ঘটনাতেও অবিচার করেন তবে প্রজাদের নৈতিক পতন অবশ্যই হইবে” - রাজা তুলাদণ্ড আনাইয়া কপোতকে একদিকে রাখিয়া অন্যদিকে নিজের শরীর হইতে এক বৃহৎ মাংসখণ্ড কাটিয়া রাখিলেন। কিন্তু দেখা গেল উহা কপোতের বরাবর হইল না। এদিকে প্রজা ও মল্লী মণ্ডলীতে ভীষণ হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা কয়েকবার মাংস কাটিলেন কিন্তু তাহাতেও কপোত পরিমাণ হইল না। পরে রাজা নিজেকে তুলাদণ্ডে রাখিলেন। ঠিক সেইসময় বাজ ও কপোত অগ্নি ও ইন্দ্ররূপ ধারণ করিলেন এবং রাজার স্বেচচারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর রাজা আর রাজ্য করিলেন না, পুত্রের হস্তে রাজ্য দান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন।

এই ঘটনার সহিত ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের তুলনা করিতে পার; খৃষ্টান রাজা ঐ বিধানে হিন্দুদের উপর নানা প্রকার অবিচার করেন এবং মুসলমানগণ ও খৃষ্টানগণকে ঘৃষ দিয়া শাসন বিধান স্থাপনা করেন। শাসন বিধানে বৃহৎ ঘৃষ পাইয়া মুসলমানগণের এক বৃহৎ অংশ ভীষণ নৈতিক পতন বরণ করে। ফলে দেশের সর্বত্র হিন্দুদের উপর অরাজকতা হইতে থাকে ও শাসন যন্ত্রের সমস্ত অঙ্গে ঘৃষেরই রাজত্ব চলিতে থাকে। মহারাজ শিবির কথা “রাজার অবিচারে প্রজার নৈতিক পতনের কথা” একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। তোমরা মুসলমান শাসক নিজামের শাসন সংস্কারেও ঐরূপ কুৎসিত অবিচার হিন্দুদের উপর দেখিতে পাইবে। ইহাতে বুঝিতে পারিবে স্বেচচার ও নীতি আমাদের জাতের সংস্কারে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের তুলনায় কিরূপ উচ্চ আদর্শে বিদ্যমান। তোমরা কখনও অবিচারকে স্বেচচার বলিয়া মনে করিও না। যে রাজা এবং নেতা অবিচারের পক্ষপাতী তাঁহারা এই পৃথিবীতে পশুর তুল্য।

মহারাজ শিবির ঘটনা তোমরা মিথ্যা মনে করিও না। এইরূপ ঘটনা সব সময় ঘটে না। এই রূপ ঘটনা কেন ঘটে এবং কিভাবে ঘটে, প্রেত উপাসনা অংশে তোমাদের নিকট স্পষ্ট হইবে।

**মহারাজ যযাতি**। ইনি জরাগ্রস্ত হইয়াও দেখিলেন বিষয় ভোগের তৃপ্তি হয় নাই। ইহাতে খুবই স্ত্রিয়মাণ হইলেন। কিন্তু পরে জানিতে পারিলেন, যদি তাঁহার জরাকে গ্রহণ করিয়া কোন যুবক তাঁহাকে যুবকত্ব দান করেন তবে তিনি দীর্ঘ দিনের যৌবন লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র এই প্রস্তাবে রাজী হইলে ইনি যৌবন ফিরিয়া পান। কিন্তু বহু বৎসর ভোগ করিয়া বুঝিলেন তাঁহার ভোগ পিপাসা একরূপই রহিয়াছে। ইহাতে তিনি বিষয় ভোগের সব বিজ্ঞানই বুঝিলেন এবং পুত্রকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া জরাবরণ করিলেন। মহারাজ যযাতি পরম জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। বেদের বহু মন্ত্রের ইনি ঋষি। তিনি ভোগের স্ত্রবিধা থাকা সত্ত্বেও ভোগের অতৃপ্তির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম জানিয়া উহাকে ত্যাগ করিয়া ছিলেন। তোমরাও সংসার জীবনে এই মহান্ সত্য অনুভব করিতে পারিবে এবং তোমরা নিশ্চয়ই সাবধান হইয়া জীবনকে ধর্মানুশীলন দ্বারা জ্ঞানময় ও শান্তিময় করিতে চেষ্টা করিবে না।

**ভীষ্ম**। পিতামহ ভীষ্মের কথা তোমরা জান। ইনি বাল ব্রহ্মচারী, ত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ, বীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। ইচ্ছামৃত্যু এই মহাবীরের আয়ত্তে ছিল। ইনি শরশয্যা তিনমাস কাল অবস্থান করিয়া উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে দেহত্যাগ করেন। রক্তমাংসের শরীরে ইহার এই বীরত্ব স্মরণীয় বিষয়। ইনি এ বয়সেও পূর্ণ কর্মক্ষম ছিলেন।

**মহাবীর কর্ণ**। সূতপুত্র বলিয়া ইহার অখ্যাতি ছিল। এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও ইনি সমাজ প্রতিষ্ঠায়, ধর্মে, শৌর্যে, ত্যাগে ও দানে সেই যুগের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আজকাল দেখা যায় অনেকে নিজেকে হীন প্রতিষ্ঠা মনে করিয়া খৃষ্টান বা মুসলমান হইতে চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য ইহা দ্বারা তাহার প্রতিষ্ঠার কোনই উন্নতি হয় না। তাহার সমাজও উন্নত হয় না। চিরজীবন সে নিজেকে আরও হীন প্রতিষ্ঠা মনে করে। সমাজ জীবনের সংঘর্ষকে যদি ইহারা কাজে লগাইতে পারে তবে একজন যে কোন পতিত সমাজকে অতি উচ্চ প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। আমরা প্রত্যেক অনুন্নতকে ভাব প্রবণতা ত্যাগ করিয়া ও পৌরোহিত্যবাদের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নিজের সমাজকে শক্তিশালী সমাজের অঙ্গরূপে পরিণত করিতে এবং মুসলমান ও খৃষ্টানগণকে সেই শক্তিশালী অঙ্গে টানিয়া আনিতে বলি। ইহা দ্বারা হিন্দু সমাজের যে মৃত্যু লক্ষণ দেখা দিয়াছে উহা শেষ হইবে। এবং ইহা দ্বারা তোমরাও সমাজে বিশেষ সম্মানযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। তোমাদের কি প্রয়োজন যে অন্যের নিকট বড় প্রতিষ্ঠা চাও ? যে শক্তিশালী, সে বড় হইবেই। তোমরাও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সংস্কার গ্রহণ কর না ? তোমাদিগকে আটকায় কে ? তোমরা তো হিন্দু সমাজের একটা প্রকাণ্ড শাখা। তোমরাও ত্যাগ, তপস্যা, যোগ, নিষ্কাম কর্ম ও দানদ্বারা নিজ অংশকে মহিমাময় কর। এ সব উচ্চ আদর্শ ত্যাগ করিয়া অনেককে ছলনা করিতেও দেখা যায়। উচ্চ বর্ণের পদবী গ্রহণ করিয়া উচ্চ বর্ণের মধ্যে মিশিয়া তাহাদের মধ্যে ছলনা করিয়া বিবাহ বন্ধনের চেষ্টা কখনও সমর্থনীয় নহে। গোয়ালারা ‘ঘোষ’ পদবী গ্রহণ করিলেও কায়স্থ ‘ঘোষ’দের সঙ্গে ছলনা করিতে শুনা যায় নাই। মনে রাখিও, ছলনা কখনও সমাজকে উন্নত করিতে সাহায্য করে না। একই পদবী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীতে যুগযুগান্তর হইতে বিদ্যমান; কিন্তু কোথাও ছলনার অনুষ্ঠান হয় না। জ্ঞান অর্জনের জন্য অনেকে অনেক

সময় আত্মগোপন করিয়াছেন, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে ছলনা কখনও সমর্থনীয় নহে, বরং দণ্ডনীয়।

মহাবীর কর্ণ আত্মপরিচয় গোপন করিয়া মহর্ষি পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। একদিন মহর্ষি কর্ণের উরুতে মাথা রাখিয়া ভূমিতে শয়ন করিলেন। এক গোবরে পোকা মাটিতে গর্ত করিতে করিতে কর্ণের উরুস্থান ছিদ্র করিয়া ফেলিল। গুরুর নিদ্রায় ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া কর্ণ উরু সরাইলেন না। রক্তধারা মহর্ষির শরীরে স্পর্শ করিয়া মহর্ষির নিদ্রা ভঙ্গ করিল। মহর্ষি জাগিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বুঝিলেন এইরূপ বীরত্ব ব্রাহ্মণ সন্তানে সম্ভব নহে। মহর্ষি তাঁহাকে শাপ দেন যে মৃত্যুকালে তাঁহার রথ মাটিতে বসিয়া যাইবে। কর্ণের মৃত্যুকালে তাহাই ঘটিয়াছিল। গুরুসেবার এইরূপ অপূর্ব নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার আদর্শের কথা ভাব। শক্তিবাদী গুরু ও শক্তিবাদী শিষ্য মিলনে যাহা সম্ভব হয় উহা দ্বারা মানুষের সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন, ধর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনে নূতন শক্তি সঞ্চার হয়। কর্ণের জীবনের প্রত্যেকটি অংশ অপূর্ব বীরত্ব, ত্যাগ, শৌর্য ও সহিষ্ণুতাময় এবং চমৎকার।

**অর্জুন।** অর্জুনের বীরত্ব, ত্যাগ, বুদ্ধিমত্তা ও রণকৌশল সমস্ত মহাভারতের মণি। মহাভারতের যুদ্ধ এক ভয়াবহ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে নানা প্রকারের অদ্ভুত অস্ত্রের প্রয়োগ হইয়াছিল। অর্জুনের নিকট ‘পাশুপৎ’ প্রভৃতি এক এক ভীষণ ভীষণ শক্তিশালী অস্ত্র ছিল। উহাদের একটী মাত্র অস্ত্রের এত বল ছিল যে অর্জুন শুধু এইরূপ একটী অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ বিজয়ী হইতে পারিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, অর্জুন উহা প্রয়োগ করেন নাই। ‘পাশুপৎ’ অস্ত্রকে শিবের অস্ত্র বলা যায়। শিব পারদ ধাতুর দেবতা। কাজেই মনে হয় পারদ নিহিত শক্তিকণায় উহা নির্মিত ছিল। বিগত মহাযুদ্ধে আমেরিকা জাপানের উপর “এটম্ বম্ব্” প্রয়োগ করিয়া বর্ষরতার চরম অনুষ্ঠান দেখাইয়া জাপানকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে। এইরূপ ঘটনায় তোমরা সহজেই বুঝিতে পার এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের বর্ষরতার মনোবৃত্তি কিরূপ জঘন্য স্তরে আসিয়া নামিয়াছে। ইহারা আজও ঐ বর্ষরতার গভীরতা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। কাজেই আমাদের মত মহান্ জাতির উত্থান ও শক্তিশালী পৃথিবীর মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। শক্তি অর্জন করিবে, কিন্তু উহা বর্ষরের মত প্রয়োগ করিবে না। অর্জুন আমাদের ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন।

**গুরু গোবিন্দ।** ইনি ভাববাদী শিখ (শিষ্য) সম্প্রদায়কে এক শক্তিবাদী সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। মুসলমান শাসকগণের বর্ষরতা ও অত্যাচার এই মহাপুরুষের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। ইনি শিখ সম্প্রদায়কে এক শক্তিশালী যোদ্ধা সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। আজকাল এই পৃথিবীতে ইহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। এই বীর মহাপুরুষের দুই পুত্র ছিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় দেওয়ালে গাঁথিয়া মারেন এবং বর্ষরতা ও নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শন দেখান। কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখ, বর্ষরতা দেখিয়া শিষ্যরা একদিনও ভয় পান নাই। অনুন্নত হিন্দুগণ যদি ঐ বীরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর তবে তোমরাও এক শক্তিশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে। গুরু গোবিন্দ জন্মোৎসব কার্তিক পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুস্থানের জন্য ইহার শিষ্যদের

আশ্চর্য্য ভালবাসা। বর্ণ হিন্দুরা ইহাদের জল স্পর্শ করে না; কিন্তু ইঁহারা সেজন্য মোটেই ক্ষুব্ধ নহেন। আত্ম বিশ্বাস ও শক্তিমত্তা যাঁহাদের থাকে তাঁহারা মনুশ্রুতের উপাদান বিশিষ্ট মানুষই হয়। মহাত্মার নির্দেশে মানুষ মহান্ মানুষ হয় এবং পশুতুল্য গুরু হইলে সমাজ পশু তুল্য হয় এবং নপুংসক গুরু সমাজকে নপুংসক করেন।

**প্রতাপসিংহ**। এই মহান্ পুরুষ এই পৃথিবীর মধ্যে স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কিরূপ ভীষণ আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও কঠোরতার মধ্য দিয়া ইনি স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন তোমরা উহা ‘রাজস্থান’ ইতিহাসে জানিয়া লইবে।

**শিবাজী**। ইনি ‘রামদাস স্বামী’ নামক এক মহাতপস্বীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় এই বীর পুরুষ মহারাষ্ট্রদেশে এক শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া তোলেন। আওরঙ্গজেবের বর্বরতার যুগ ভাঙ্গিবার মূলে এক দিকে শিষ্য-সম্প্রদায় ও অন্যদিকে মহারাষ্ট্রীয় বীরদের আত্মত্যাগ বিশেষ কারণ হইয়াছিল। এই মহান্ জীবন চরিত্র হইতে আমরা ভালভাবেই ইহা শিক্ষা করিতে পারি যে সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে বর্বরতার যুগ ভাঙ্গিয়া দেওয়া কঠিন নহে, বর্বরতার ভিত্তি হইতে সভ্যতার ভিত্তি অনেক শক্তিশালী।

**স্বামী দয়ানন্দ**। ইনি আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আমাদের সামনে স্থাপনা করিয়া যান। ইনি আমাদের দেশের পৌরোহিত্যবাদকে ভাঙ্গিবার আধুনিক মহাত্মাদের অন্যতম। ইনি শুধু বেদকে ভিত্তি করিয়া এক স্কন্দর ধর্ম্ম স্থাপনা করেন। ইহাতে বেদের জ্ঞান ভাঙার পৌরোহিত্যবাদিগণের মুষ্টির বাহিরে চলিয়া আসে। ব্যাস লিখিত বেদান্ত-দর্শন যেমন বেদের জ্ঞান ভাগের একটা স্ননির্দিষ্ট মীমাংসা গ্রন্থ, স্বামী দয়ানন্দজীও বেদের কর্ম্মকাণ্ডের একটা স্ননির্দিষ্ট মীমাংসা দেখাইয়াছেন। ব্যাসের মতে আকাশ, প্রাণ, ঐশ, হংস, তং, লিঙ্গ, ব্রহ্মা প্রভৃতি শব্দ একই ব্রহ্ম বাচক। স্বামী দয়ানন্দের মতেও ঠিক ঐরূপ রুদ্র, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, বিশ্বদেব প্রতি দেবতা বাচক শব্দগুলি সবই একই ঐশ্বর বাচক বা ব্রহ্ম বাচক। তিনি অসীম পাণ্ডিত্যদ্বারা ইহার প্রমাণ করিয়াছেন। তোমরা যখন বেদ পাঠ করিবে তখন দেখিতে পাইবে বেদের বহু বহু মন্ত স্বামীজীর মতের সমর্থন করিতেছে। প্রমাণ যথা -

“সর্বে বেদা, যৎ পদামামনস্তি

তপাংসি সর্বানি চ যৎ বদন্তি”। ইত্যাদি

(উপনিষদের জ্ঞান অংশ উদ্ধৃত মন্ত্রে দেখ)

এই মহাপুরুষের প্রভাবে বৈদিক চিন্তা জগতে যে একটা যুগান্তর আসিয়াছে - ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার মূর্ত্তি খণ্ডনের সহিত আমরা একমত নহি, আমরা জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরকে বুঝাইবার জন্য মূর্ত্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। ইহা স্থাপনার দ্বারা ধর্ম্ম, জ্ঞান ও শক্তি প্রতিষ্ঠার সহায়তা হইয়া থাকে।

স্বামী দয়ানন্দজী কেবল আর্য্য শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি কুরাণ এবং বাইবেলের উপরও নিজের অভ্রান্ত যুক্তি দেখাইয়াছেন। তোমরা উহা পাঠ করিলে আরব্য দার্শনিকতা ও ইহুদি দার্শনিকতা আমাদের বৈদিক দার্শনিকতা ও যুক্তিবাদের তুলনায় কত নিম্ন স্তরের উহা বুঝিতে পারিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ। ইনি আমাদের নিকট এবং এই পৃথিবীর নিকট অত্যন্ত পরিচিত মহাত্মা। তাঁর তেজস্বিতা, যুক্তিবাদ, ত্যাগ ও স্বদেশ প্রেম তোমরা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। ইনি চিকাগো ধর্মসভায় অকাট্য যুক্তিতে প্রমাণ করেন যে হিন্দুধর্মই প্রকৃত মানবধর্ম। ইনি পশ্চিম দেশে আমাদের হিন্দুর জ্ঞানবাদের প্রচার এবং আমাদের দেশে পশ্চিমের কর্মবাদের প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলতঃ ইনি ইহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্রান্ত ভবিষ্যৎ বাণী - “যদি পশ্চিম হিন্দুর জ্ঞান ও দার্শনিকতা গ্রহণ না করে তবে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য।” অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। তিনি আমাদের দেশে পশ্চিমের কর্মবাদ প্রতিষ্ঠার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে এই বিষয়ে মোটেই একমত নহি। দ্রান্ত দার্শনিকতার ভিত্তিতে দ্রান্ত কর্মবাদ অদ্রান্ত দার্শনিকতার ক্ষেত্রে ভারতের কোন কল্যাণ করিতে পারে না। আমরা নিজেদের কর্মবাদ নূতন ভাবে সংস্কার করিয়া লইবার পক্ষপাতী। তিনি রামকৃষ্ণকে অবতার করিবার চেষ্টা করিবার দরুণ রাজা রামমোহন প্রবর্তিত সর্বধর্মসমন্বয়বাদ আমাদের দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে আমাদের মধ্যে ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে আসল ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বাধা পায় এবং সমাজ জীবনে আমরা নানা প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ি। ইহা ভিন্নও অশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে খৃষ্টানগণ বিনা বাধায় ধর্ম প্রচারের পথ পায়। অশিক্ষিতগণ খৃষ্টান হইতে চলিলেও তাঁহার প্রবর্তিত মিশনবাদিগণ আজ পর্য্যন্ত ইহার কোন প্রতিকার করেন নাই। হিন্দুরা অহিন্দু বর্করতাদ্বারা নির্য্যাতিত হইতে থাকিলে উহার প্রতিকার বা প্রতিশোধেও মিশনবাদীদের সাহায্য পাওয়া যায় না। কয়েকটি সিদ্ধান্তে একমত না হইলেও তিনি আমাদের পূজ্য মহাপুরুষ।

**সতী।** এবার আমরা নারী মহাত্মাগণের কথা বলিব। আমাদের দেশে বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু নারী মহাত্মা হইয়া গিয়াছেন। ইহাদেরও সংখ্যা পুরুষদের মতই অসংখ্য। বেদের অনেক স্তন্দর স্তন্দর মন্তের ঋষি নারী। আমরা এখানে প্রথমে সতীর কথাই বলিব।

সতীর অন্য নাম ‘উমা’। ইনি মহারাজ দক্ষের কন্যা ছিলেন। শিবের সঙ্গে ইহার বিবাহ হয়। দক্ষ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে তিনি শিব ও উমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। উমা কিন্তু ইহাতে বিরত হইলেন না। তিনি পিতৃগৃহে যাইতে প্রস্তুত হইলেন এবং শিবের অনুমতি চাইলেন। উমা চিরদিনই একটু একগুঁয়ে প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন। তোমরা এই ঘটনাকে একেবারে লীলা মনে করিও না। এক যুগে সত্য সত্যই আমাদের দেশে এইরূপ স্বভাব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁহাদের চরিত্র এমনই স্তন্দর ও মহান ছিল যে আমরা তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে বাসিতে দেবতা ও ঈশ্বরে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছি। কৃষ্ণ রাম ও বুদ্ধকে আমাদের মধ্যে অনেকে এত ভালবাসেন যে তাঁহারা মনেই করিতে পারেন না যে ইহারা ঈশ্বর নহেন। এক যুগে যঁাহারা আমাদের দেশের রাজা বা নেতা ছিলেন, পরবর্ত্তী যুগে তাঁহারা আমাদের মনের মধ্যে দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছেন।

একটু একরোকা বুদ্ধি থাকিবার কারণ, উমা যদি কোন কথা একবার মনে মনে আঁটিয়া বসিতেন তবে কাহারও শক্তি ছিল না যে তাঁহাকে নিরস্ত করে। তিনি পিতার

নিতান্ত অনিচ্ছায় স্বয়ম্বর সভায় শিবকে নিজের পতিত্বে বরণ করেন। উমা কোন দিনই ভোগ বিলাসে মগ্ন ছিলেন না। তিনি পাহাড়, পর্বতে, বনে, জঙ্গলে, তপস্যা ও সাধনা করিবেন ইহাই তাঁহার অত্যন্ত কাম্য ছিল। তাই তিনি শিবকেই বাল্যকাল অবধি পতি করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। শিবকে পতি বরণ করিবার দরুণ ইনি পিতার অপ্রিয় হন। এখানেও তিনি ভাবিলেন, বাবার নিকট যাইব, তাহাতে নিমন্ত্রণের আবার প্রয়োজন কি? আসল কথা তাঁহার বাবা, মা, ভাই, বোন, দাস, দাসীদের স্নেহে টান পড়িয়াছে। কাজেই তিনি যাইবেন দৃঢ় সংকল্প হইলেন। এবং এই অবস্থায় যাওয়াটা অন্যায় হইবে ভাবিলেন না। উমার জেদ্, যাইবেন এবং শিবেরও আদেশ লইবেন।

উমা কঠোর তপস্বিনী ছিলেন। নিজের তপঃশক্তি প্রয়োগ দ্বারা শিবকে আদেশ দিতে বাধ্য করিলেন। শিব বুঝিলেন, ইনি অনাদি মহাশক্তি। উমা দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করিয়া নিজের অসীম তপঃশক্তি প্রকট করিলেন। জীব মাত্রই যে অনাদি মহাশক্তি বা পরমব্রহ্ম, ইহা জ্ঞানের শেষ প্রান্তে বুঝা যায়। উমা তপস্যা ও সাধনার বলে সেই শক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যে কোন নরনারীই জ্ঞানের এই সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। শিব বুঝিলেন, উমা আর সহজ মেয়ে নাই কাজেই যাইতে অনুমতি দিলেন।

উমা যজ্ঞ মণ্ডপের নিকটস্থ হইবা মাত্রই মহারাজ দক্ষ তাঁহাকে তিরস্কার এবং শিবকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। পতি তাঁহার এতই প্রিয় ছিলেন যে এই ভর্তসনা তাঁহার নিকট অসহ্য হইল; তিনি সেই স্থানেই দেহত্যাগ করিলেন।

একজন শক্তিবাদী ব্রহ্মবিদুষী নারীর চরিত্র কিরূপ হইতে পারে ইহা আমরা উমার চরিত্রে পূর্ণ ভাবেই দেখিতে পাই। তিনি জ্ঞানী ও মহাশক্তিশালিনী হইয়াও ঠিক একজন সাধারণ কন্যার মত বাপের বাড়ী যাইবার জন্য জেদ্ ধরিলেন। পিতার নিকট আসিয়া সাধারণ সতী মহিলার মত তাঁহার স্বভাব দেখা দিল। একাধারে অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক জ্ঞান, অন্যদিকে সাধারণ জীবের মত মনের গতি। ইহা আমরা সমস্ত বড় বড় মহাপুরুষ ও ব্রহ্মবিদুষী কন্যাগণের চরিত্রে দেখিতে পাই। অসীমরূপে নিজেকে জানিবার পরও জীবত্বের সবটুকু মাধুর্য্য যিনি নিজের চরিত্রে অকৃত্রিম ভাবে ফুটাইয়া লইয়াছেন তাঁহাকেই মানুষ ঈশ্বর ও দেবতা জ্ঞানে নিজের মনের কোণে স্থান দিয়াছে। সতীর চরিত্রের মত এমন স্কন্দর চরিত্র হিন্দু জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

সতীর দেহত্যাগের ভীষণ দুর্ঘটনা মুহূর্ত্তে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। উমার সাথী নন্দী এই খবর শিবকেও প্রদান করিল। শিব সদলবলে যজ্ঞস্থলে চলিয়া আসিলেন। দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হইল। শিব উমার মৃতদেহ নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। দক্ষ সেই সময় এদেশের সম্রাট ছিলেন, কাজেই দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে এই খবর ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করিল। শিব উমাদেহ স্কন্ধে ধারণ করিয়া দেশ বিদেশ ঘুরিতে লাগিলেন। কাজেই আন্দোলন আরও তীব্র হইয়া উঠিল। তখন দেবতাগণ ইহার প্রতিকারের উপায় স্থির করিলেন। বিষ্ণু শিবের পেছনে পেছনে থাকিয়া ধীরেধীরে নিজের চক্র দ্বারা উমার মৃতদেহ শিবের অলক্ষ্যে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। যে স্থানে উমার দেহের খণ্ড পতিত হইয়াছিল সেই সব স্থানই আজ তীর্থ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। তোমরা ৫১

পীঠস্থানের কথা শুনিয়েছি। এই ৫১ পীঠস্থান কেবল ভারতের মধ্যেই অবস্থিত নাই। ইহা ভারতের বাহিরেও অবস্থিত। এই সব পীঠস্থানে উমার দেহ অংশ পতিত হইয়া ছিল।

যাহারা সতী প্রথাকে অসভ্য মনে করে তাহারা ভোগ লিপ্সাটাই বুঝে; কিন্তু ভালবাসা, প্রেম, তপস্যা, সাধনা, ব্রহ্মজ্ঞান এবং শক্তি লাভ বিজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারেই অন্ধ। আজও আমাদের দেশে কত নারী পতির সঙ্গে সঙ্গে শরীর ত্যাগ করিতেছেন, শুনা যায়।

আমরা উমাকে যে কত ভালবাসি, তাঁহার জীবন ও আদর্শকে কত উন্নত করিয়া রাখিয়াছি উহা তীর্থগুলি দেখিলে বুঝিতে পারিবে। তোমরা দুর্গা পূজার মন্ত্ৰে দেখিবে “ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী-কোটী-পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ স্ত্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ” অর্থাৎ যিনি দক্ষযজ্ঞ বিনাশের কারণ, যিনি কোটী যোগিনী পরিবৃত্তা (অর্থাৎ যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কোটি কোটি শক্তিকণা জিয়াশীল আছে), যিনি ভদ্রকালী স্বরূপা (কালচক্র যখন আঙ্গুরিক প্রভাব মুক্ত হইয়া আমাদের অনুকূল হয় সেই কাল বা সময়ই মঙ্গলময় কাল; এইরূপ কালই ভদ্রকালী), যিনি ওঁ স্বরূপা (ব্রহ্মস্বরূপ) এবং স্ত্রীং (মহাশক্তি) স্বরূপা, তাঁহাকে প্রণাম।

যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মশক্তির প্রভাব নিজের জীবনে দেখাইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তিরূপে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। এইরূপ মহান মানবের স্মরণ ও ব্রহ্মস্মরণ একই বস্তু। পূজামন্ত্ৰে এই দক্ষ যজ্ঞবিনাশিন্যৈ অংশে যে শ্রদ্ধা, যে উচ্চ ধারণা উমার উপর অর্পিত হইয়াছে, উহা একটুও অন্যায় হয় নাই।

উমার তপঃশক্তি, ত্যাগ, সাধনা, পতিপ্রেম সব মিলাইয়া উমাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাগণও এইরূপে নিজেদের কর্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি দ্বারা আজ ঈশ্বর রূপে পূজনীয় হইয়াছেন; কিন্তু আমাদের মনে হয় উমার মত স্থান কেহই পান না। উমা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রত্যেক নরনারীর আদর্শ মূর্তি। তোমরা দ্রৌপদী ও রাজস্থানে মহিলাদের জীবন চরিত্রে এই মহান আদর্শই দেখিতে পাইবে।

তোমরা যদি হরিদ্বারে যাও তবে উমার বিবাহের কুশণ্ডিকার অগ্নি আজও দেখিতে পাইবে। এই অগ্নি এখন “ত্রিযুগী নারায়ণ” বলিয়া খ্যাত। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, তিন যুগে বিদ্যমান বলিয়া ইনি ত্রিযুগী নারায়ণ। তোমরা এ সব ঘটনাকে গল্প মনে করিও না। এইসব ঘটনা আমাদের সত্যই ঘটিয়াছিল।

একযুগে শক্তিশালী নরনারীগণকেই আমরা পরবর্ত্তী যুগে দেবতা ও ঈশ্বর-প্রতীকরূপে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছি। তাঁহাদের চরিত্রের সঙ্গে আমাদের শরীরস্থিত ব্রহ্মনাড়ী, উহার শাখা প্রশাখা ও মর্ম্মকেন্দ্র প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া লইয়া আমাদের জীবনকে মহান করিয়া লইয়াছি। ইহা মোটেই অন্যায় হয় নাই। কারণ বীরত্ব, শান্তি, ত্যাগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি উন্নত চরিত্রের উপাদান আমাদের শরীরে ও মনেই বিদ্যমান আছে। বিচার করিলে দেখা যায় যাঁহারা ত্যাগ ও বীরত্বে মহান হইয়াছেন তাঁহাদের শরীর স্থিত ঐ সব মর্ম্মাংশই ঐরূপ মহান হইতে সাহায্য করিয়াছে।

মহাশক্তি বা ব্রহ্মের লীলারূপই এই জগৎ । এই জগতের যে সব স্থানে ব্রহ্মজ্ঞানী এবং ব্রহ্ম-বিদূষীগণের শক্তি মাধুর্য্য হইয়াছে সেই সব স্থানের মাহাত্ম্য একটু বেশী

হইবারই কথা। মহামায়ার লীলাকথার এক স্কন্দর গল্প তোমাদিগকে বলিতেছি - হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে এক মহাতপা সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি সর্বদাই ‘মায়ী’ দেখিবার জন্য পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব ঘটনাই একজন সিদ্ধ জ্ঞানীর নিকট যে মায়ী বিশেষ, উনি ইহা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া ‘মায়ী দেখিবার’ প্রার্থনা করতে লাগিলেন।

একদিন সন্ন্যাসী গঙ্গার তীরে বহির্বাস ও কমণ্ডলু রাখিয়া গঙ্গায় স্নান করিতেছেন, এমন সময় এক কুমীর তাঁহাকে গ্রাস করিল। কিছুক্ষণ বাদ দেখিলেন তাঁহার আত্মা এক বেদেনীর গর্ভে প্রবেশ করিল। পরে যথা সময় তাঁহার জন্ম হইল। তিনি বেদেনীর কন্যা হইয়া জন্মিলেন। কন্যার বয়স হইল। বিবাহ হইল। গঙ্গার ধারেই এক বেদের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। এক একটি করিয়া ৪টা সন্তান হইল। সন্ন্যাসীর আত্মা এ সব কাণ্ডে বেশ মত্ত হইলেও তিনি সবই দেখিতে ছিলেন। একদিন বেদেনী গঙ্গায় স্নান করিতে করিতে কুমীর তাহাকে গ্রাস করিল। কুমীর তাহাকে গঙ্গার অন্য পারে আনিয়া ছাড়িয়া দিল। সন্ন্যাসী দেখিলেন তিনি আর বেদেনী নাই। সেই সন্ন্যাসীই আছেন। তিনি স্নান করিয়া উপরে উঠিলেন এবং দেখিলেন সেই কমণ্ডলু ও বহির্বাস সেই স্থানেই রহিয়াছে। তিনি গা মুছিতেছেন আর ভাবিতেছেন, এ কিরূপ ঘটনা! এতকাল কাটিয়া গিয়াছে, সেই কাপড়, সেই কমণ্ডলু। আরও ভাবিতেছেন, বেদেনী হইয়া তাঁহার একটা জন্মের কথা। ঠিক এমন সময় বেদে আসিয়া বলিল; মহারাজ, বলুন, আমার বেদেনী কোথায়? সন্ন্যাসী যতই জবাবকে উপেক্ষা করিতে ছিলেন, বেদে তাঁহাকে ততই ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শেষ কালে সন্ন্যাসী বলিলেন - তোমার বেদেনীর কথা আমি আর কি বলি, আমিই তো তোমার বেদেনী, কিন্তু আমার সে জন্ম শেষ হইয়াছে। তুমি আর আমাকে পাইতে পার না। বেদে বলিল - আমি আর আপনাকে পাইতে চাই না। কিন্তু সন্তানগুলি অত্যন্ত ছোট, আপনি উহাদিগকে যাইয়া দেখুন। একটু বড় হউক, পরে আপনি চলিয়া আসিবেন। নতুবা আমার কাজকর্ম সবই বন্ধ হইয়া যাইবে। ছোট ছোট বাচ্চা, ওদের না দেখিলে আমি কিছুতেই উহাদিগকে বাঁচাইতে পারিব না। সন্ন্যাসীর সব যুক্তিই বেদে কাটিতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্ন্যাসী কাঁদিতে লাগিলেন। বেদে তাতেও ছাড়ে না। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসী মাটিতে পড়িয়া গেলেন। আরও কাঁদিতে লাগিলেন - “হে পরমাত্মা একি তোর মায়ী!” এই ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসী ঘুমাইয়া পড়িলেন। জাগিয়া দেখেন, বেদে বা বেদের ডেরা কোথাও কিছু নাই। বুঝিলেন ইহাই মায়ী। তোমরাও যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর তবে বুঝিতে পারিবে এই জীব জগৎ রূপে সেই মহাশক্তি বা ব্রহ্ম কিরূপ অস্তিত্বহীন এক লীলা জুড়িয়া বসিয়াছেন।

**গার্গী।** ব্রহ্মবিদুষী গার্গীর নাম তোমরা হয়ত জান। ইনি মহামুনি গর্গের কন্যা ছিলেন। ইহার লিখিত ঋগ্বেদের ভাষ্য এখনও বিদ্যমান। মহারাজ জনকের সভায় ইনিই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্বালোচনায় খ্যাতি লাভ করেন। চণ্ডী পাঠ কালে যে দেবীসূক্ত পাঠ হইয়া থাকে (ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডল ১২৫) এই সূক্তটির ঋষিও একজন নারী। ঐ মহতী বিদুষীর নাম ‘বাণ্’। ইনি অত্বে ঋষির কন্যা ছিলেন। ইহা শক্তিস্তরের অনুভূতিজ্ঞাপক মন্ত্র। আমাদের দেশের কন্যাগণ উচ্চ বিদ্যার্জনে আত্মনিয়োগ

করিয়াকে ইহা ভাবিতে আনন্দ হয়। আমরা তাহাদিগকে সতী গার্গীর কথা স্মরণ করিতে বলি। এবং নিজস্ব কৃষ্টিতে শ্রদ্ধা রাখিতে বলি।

**রাধিকা।** আমাদের বর্তমান সমাজজীবনে এই মহিলার খুবই সম্মান দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতে এই মহিলার কথা আছে। ইনি বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া ছিলেন। স্বামীকে সতী স্ত্রী যতটা আত্মদান করিয়া ভালবাসেন তাঁহার ভালবাসা ততটাই গভীর ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য রাধিকার ভালবাসা কোনদিনই কাম ও সৃষ্টির দিকে যায় নাই। এই ভালবাসা ভালবাসাই ছিল এবং এই ভালবাসা রাধিকাকে ব্রহ্মচারিণী ও ব্রহ্মবিদুষী মহিলাতে পরিণত করে। প্রত্যেক বালিকাতে ৮ বৎসর বয়সে ভালবাসার অঙ্কুর জন্মে। এই অঙ্কুর ১৬ বৎসরে পরিণত ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়। পরে উহা বহির্মুখী হয় ও সৃষ্টির দিকে ধাবিত হয়। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত ব্রহ্ম নাড়ীর মধ্যে সত্য, প্রেম, স্মৃতি, শান্তি, জ্ঞান, সৌন্দর্য্য, এ সব কেন্দ্র বিদ্যমান থাকে। স্বাভাবিকভাবে প্রেম বহির্মুখী হইলেই যৌবন লক্ষণ দেখা দেয়। এই যৌবনকে সংযত রাখিয়া ব্রহ্ম নাড়ীতে মন একাগ্র করিতে পারিলে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য সিদ্ধ হয়। রাধিকার জীবনের আমরা যা দেখিতে পাই, উহা আমাদের ইহাই শিক্ষা দিয়াছে যে, ভালবাসাই সংযম এবং ভালবাসাই ব্রহ্মচর্য্য এবং ভালবাসাই এক আশ্চর্য্য তপস্যা। ভালবাসা যদি ঈশ্বরে বা ঈশ্বরতুল্য মহাপুরুষে অর্পিত হয় তবে সেই ভালবাসা ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞান ও সংযমেরই ফল দান করে। রাধিকার জীবনে আমরা সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মজ্ঞান যথেষ্টই দেখিতে পাই; কিন্তু উমার মত তেজস্বিতা ও শক্তিমত্তা দেখিতে পাই না।

**শবরী।** এই তপস্বিনী ব্রহ্মবিদুষীর কথা রামায়ণে আছে। ঔর স্নেহময় ভালবাসা ইহাকে ঋষিভে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। ইনি ত্রিকালদর্শী ছিলেন। ইনি ভীলকন্যা (অছুঁত) ছিলেন। বাল্যকালে শ্রীরামের কথা শুনিয়া রামের উপর ইহার আকর্ষণ হয়। যৌবনে পিতা বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করিলে ইনি তাহাতে অমত করেন। ইনি নিত্য ফল, মূল ও পুঞ্জ চয়ন করিয়া রামের জন্ম অপেক্ষা করিতেন। ঔর একনিষ্ঠ ভক্তির বিস্তারিত কথা জানিলে তোমাদের চক্ষে জল আসিবে। ইনি অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে রামের দর্শন পান। রামকে কোলে লইয়া ইনি আহার করাইয়া ছিলেন। রাম ও শবরীর মিলন অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনার পর ইনি শরীর ত্যাগ করেন। ভালবাসা আজকাল আমাদের সমাজে কামজ ব্যাধি রূপে প্রবেশ করিয়া সমাজের ক্ষতি করিতেছে। প্রকৃত ভালবাসা ঈশ্বরেই সম্ভব এবং উহাই ব্রহ্মচর্য্য। এই সঙ্গে তেজ, বীরত্ব ও কর্মশক্তি থাকিলে জীবন মহান হয়।

## দেবতা উপাসনা ও দৈব সম্পদ

দেবতা বলিতে কি বুঝা যায় উহা তোমাদের জানা প্রয়োজন। আমাদের মনের মধ্যে নানাপ্রকার দৈব বৃত্তির উদয় হয়। এই সব দৈব বৃত্তিই দেবতা। যেমন, দান করিবার ইচ্ছা; উপকার করিবার ইচ্ছা; ত্যাগ করিবার ইচ্ছা; কোন দুষ্ট, চোর, গুণ্ডা বা অসুর অত্যাচার করিতেছে, উহার প্রতিশোধ ইচ্ছা, ইত্যাদি। এই মনোবৃত্তিগুলিকে দৈব ভাব

বা দেবতা বলে। আমাদের মনে চুরি, চালবাজী, মিথ্যা, ছলনা, গুণামী, বর্বরতা এবং অন্তের অনিষ্ট করিবার কুমতলব উদয় হইলে উহাদের নাম হয় ‘আঙ্গরিকতা’। গীতা পড়িলে তোমাদের এই ভাব আরও স্পষ্ট হইবে। গীতার ২৬টী প্রধান দৈবভাব ও ৫টী প্রধান আঙ্গরিক ভাব-এর উল্লেখ আছে। দৈবীভাব অবলম্বন করিলে তাঁহাদের নাম হয় দেবতা, আঙ্গরিকভাব অবলম্বন করিলে তাহাদের নাম হয় অঙ্গর।

অভয়, চিন্তাশুদ্ধি, যোগ ও জ্ঞান নিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (বেদাদি অভ্যাস), তপঃ, সরলতা, অহিংসা (অন্তের অনিষ্ট করিবার নাম হিংসা), সত্য, অজ্ঞোদ, শান্তি, অপেশন (চুগলী খোড়ি না করা), দয়া, নির্লোভিতা, ধীরতা, লজ্জা প্রবণতা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, অজ্ঞোদ, অবৈরিতা (ঈর্ষাহীনতা), নিরভিমানিতা, - ইহাই দৈব সম্পদ। ইহাদের মধ্যে ৫টী প্রধান যথা- অভয়, তেজ, সত্য, প্রেম (অহিংসা) ও শান্তি। এই পাঁচ দৈবীভাবকে যদি তোমরা ঠিক ঠিক বৃষ্টিতে পার তবে তোমাদের জীবন সব দিক দিয়া ঠিক পথে পরিচালিত হইবে।

৫টী আঙ্গরিক সম্পদ যথা - দম্ব, দর্প, অভিমান, জ্ঞোদ ও পারুণ্য। দৈবীভাবগুলি জ্ঞান, ত্যাগ ও যুক্তিবাদ মূলক। আঙ্গরিক ভাবগুলি অহংকার, স্বার্থ, যুক্তিহীনতা ও অজ্ঞানতা মূলক।

অভয় ও সত্য কিরূপ শক্তিশালী বস্তু উহা তোমরা কিছুদিন অভ্যাস দ্বারা বৃষ্টিতে পারিবে। মনে রাখিবে, ধর্ম অনুষ্ঠানের বিষয়। একবার নির্ভীক হও, দেখিতে পাইবে, আরও একবার নির্ভীক হইবার শক্তি আসিয়া গিয়াছে। বেদ হইতে অভয় সম্বন্ধে কয়েকটী স্কন্দর মন্ত্র লিখিতেছি। যথা -

১। যথা দৌশ্চ পৃথিবী চন বিভীতো ন রিণ্ডতঃ

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ অথর্ববেদ কাণ্ড ২ ॥ সূক্ত ১৫। মন্ত্র ১ ॥

যেমন পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ নির্ভীক এবং কখনও কক্ষচ্যুত হয় না সেইরূপ হে আমার প্রাণ, তুমি নির্ভয় হও।

২। যথা হশ্চ রাত্রীচ ন বিভীতো ন রিণ্ডতঃ

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ অথর্ব কাণ্ড ২। সূক্ত ১৫। মন্ত্র ২ ॥

যেমন দিন এবং রাত্রি নির্ভীক এবং কখনও কক্ষচ্যুত হয় না অর্থাৎ অটল, সেইরূপ হে আমার প্রাণ, নির্ভীক হও।

৩। যথা সূর্যশ্চ চন্দ্রশ্চ না বিভীতো ন রিণ্ডতঃ

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ অথর্ববেদ কাণ্ড ২ ॥ সূক্ত ১৫। মন্ত্র ৩ ॥

যে রূপ সূর্য ও চন্দ্র নির্ভীক এবং কখনও কক্ষচ্যুত হয় না, ঠিক সেইরূপ হে আমার প্রাণ, তুমি নির্ভীক হও।

৪। যথা ব্রহ্ম চ ক্ষত্রংচ ন বিভীতো ন রিণ্ডতঃ

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ অথর্ববেদ কাণ্ড ২ ॥ সূক্ত ১৫। মন্ত্র ৪ ॥

যে রূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ও বীর যোদ্ধা, নির্ভীক ও অটল, সেইরূপ হে আমার প্রাণ, তুমি নির্ভীক হও।

৫। যথা সত্যঞ্চ চ অনৃতঞ্চ ন বিভীতো ন রিণ্ডতঃ

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ অথর্ববেদ কাণ্ড ২ ॥ সূক্ত ১৫। মন্ত্র ৫ ॥

যে রূপ ব্রহ্ম এবং মায়া নির্ভীক এবং নিজ নিজ কর্তব্যে অটল ঠিক সেইরূপ হে আমার প্রাণ, তুমি নির্ভীক হও।

৬। যথা ভূতংচ ভব্যংচ ন বিভীতো ন রিণ্ডতঃ

এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ অথর্ববেদ কাণ্ড ২ ॥ সূক্ত ১৫। মন্ত্র ৬ ॥

যে রূপ অতীত ও ভবিষ্যৎ নির্ভীক (অর্থাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা কিছুতেই বদলান যায় না এবং যাহা হইবে তাহাও রুদ্ধ করা যায় না, কাহারও অপেক্ষা না করিয়া হইয়া যায়) সেইরূপ আমার প্রাণ নির্ভীক হও।

**অহিংসা বা প্রেম।** সকলের সহিত সমভাবই ও সমব্যবহারই প্রেম। তুমি যেমনটী অন্যের নিকট পাইতে ইচ্ছা কর ঠিক তেমনটী অন্যের সঙ্গে ব্যবহার করিবে। ইহার নাম প্রেম। যদি দেখিতে পাও একজন তোমার নিকট ভালটী ও স্খবিধাটী আশা করে কিন্তু প্রতিদানে দুর্ব্যবহার ও অবিচার মানাইয়া লইতে চায় তখনই সাবধান হইবে; কারণ ইহা আঙ্গরিক লক্ষণ। ধর্মের নাম করিয়া বা অন্য কোন বাহানা করিয়া যে তোমার নিকট ভালটি আদায় করিয়া মন্দটি দিতে চায় তাহাকে অত্যন্ত শয়তান প্রকৃতির অঙ্গর জানিবে। এবং কোন প্রকারের স্খবিধা দানের কথা বাতিল করিয়া দিবে। বর্তমান যুগে আমাদের দেশে অহিংসার নামে মিথ্যা ধারণার প্রশয় দেওয়া হইয়াছে। জাতীয়তাবাদী নেতাগণ এমন সব অনীতির প্রশয় দিয়াছেন যাহা দ্বারা হিন্দুদের ন্যায় অধিকারে হিংসা করা হইয়াছে এবং অহিন্দুদের আঙ্গরিক দাবীকে প্রশয় দেওয়া হইয়াছে। যোগ শাস্ত্রে বলিয়াছে, “অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা নিকট কাহারও বৈরিতা থাকে না।” কিন্তু তোমরা যদি লিগ ও কংগ্রেস নীতি আলোচনা কর তবে দেখিতে পাইবে কংগ্রেস ও গান্ধীর উপর লিগের বৈরিতা দিনের পর দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তোমরা নিজের বা কাহারও উপর অবিচার করিয়া কাহারও তোষণ করিলে উহাও হিংসাই হইয়া থাকে। হিংসার ফল বৈরিতা। অহিংসার অর্থ অনীতির প্রশয় নহে।

**শান্তি।** বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উপাসনায় শান্তি লাভ হয়। নিত্য যথাসময় ব্রহ্মোপাসনায় ব্রতী হইবে। ইহা দ্বারা শান্তি বৃদ্ধি হইবে।

**তেজ।** ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ দৈবী সম্পদ। যাহারা অঙ্গর, বদমায়েস, গুণ্ডা, ইতর ও নীচ প্রকৃতির মানুষ তাহাদের দমনের জন্য শক্তি অর্জনই ‘তেজ’। পূর্বের কর্ম-ধর্ম শীর্ষক অধ্যায়ে শক্তিশালী, দুর্বল ও আঙ্গরিক তিন প্রকারের কর্মলক্ষণের কথা বলিয়াছি। এই দৈবী ভাব অধ্যায়েও তোমরা তিন প্রকারের মনোভাব দেখিতে পাইবে। আঙ্গরিক, দুর্বল ও শক্তিশালী। তেজহীন দৈবী ভাব মাত্রই দুর্বল মনোবৃত্তির লক্ষণ জানিবে। তেজহীন মানুষ ভীরা হইয়া থাকে এবং এই ভীরুতার দরুণ সত্যকথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে না। তেজহীনতা সমস্ত প্রকার দৈবী ভাব গ্রহণে অযোগ্য প্রস্তুত করে। একদল জাতীয়তাবাদী নেতা আমাদের অহিংসার তত্ত্ব না জানিয়া অহিংসার নামে নিস্তেজবাদ আনিয়া দিয়াছেন।

যাহারা দুর্বল, অঙ্গর এবং অঙ্গরের সমর্থক তাহারা তেজস্বীকে ক্রোধী বলিতে চেষ্টা করিয়া নিজেদের মূর্খতা, দুর্বলতা বা স্বার্থ সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। তোমরা খুব বিবেকের সহিত বিচার করিবে এবং দুর্বলদের কথায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। তেজস্বীরা

নিশ্চয়ই সংযতভাষী হইবে। সমস্ত বেদ এবং গীতা আদি উচ্চস্তরের ধর্মগ্রন্থে দুই ও আঙ্গরিকদের বিরুদ্ধে সাবধানতা ও বিরোধিতার উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। এবং অন্ন, বস্ত্র, ধনবৃদ্ধি ও সমাজ রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই শ্রেষ্ঠ ৫টী দৈবী সম্পদের মর্মকথার মধ্যে - স্ত্রবিচার ও আঙ্গরিক বিরোধিতাই আসল নীতি, মনে রাখিবে।

**দম্ভ।** ইহা আঙ্গরিক মনোবৃত্তি। মনে মনে নিজেকে একটা মোটা তাজা কিছু কল্পনা করিয়া লওয়া ও ব্যবহারে উহা স্পষ্ট হইলে বুঝা যায় লোকটা 'দাম্ভিক'। ইহা মূর্খতা, কুশিক্ষা ও কুধর্মমূলক অজ্ঞানবৃত্তি।

**দর্প।** ইহা দম্ভের পরিণতি। যতক্ষণ মনে ও বাক্যে মাত্র দাম্ভিকতা ততক্ষণ উহা দম্ভ। যে মুহূর্ত্তে আরও স্থূল কার্যক্ষেত্রে উহার পরিণতি বুঝা যায়, তখনই বুঝিতে হইবে এবার 'দর্প' রূপ ধারণ করিয়াছে। অকার্য্য কুকার্য্য করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করাকে 'দর্প' বলা হয়। আমাদের দেশের অনেক মহাপুরুষ অঙ্গরের দর্পনাশ করিয়াছিলেন।

**অভিমান।** অহঙ্কারী লোক প্রেমহীন, বিনয় হীন, যুক্তি হীন ও স্বার্থপর হইয়া থাকে।

**ক্রোধ।** যাহাতে তোমার ন্যায়তঃ দাবী নাই, এমন বস্তু পাইবার বাসনা হইল, কিন্তু পাইতে বাধা যদি কেহ দেয়, সেই লোকই তোমার অপ্রিয় হইবে। এইরূপ অবস্থায় তোমার প্রতিশোধবৃত্তি মনে জাগিলেই উহা ক্রোধ বলা হয়। ক্রোধ এবং তেজ সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু। কেহ অন্যায়ভাবে তোমার বা কাহারও সর্বনাশ করিতে প্রস্তুত শুধু কর্তব্য জ্ঞানে বা নিঃস্বার্থভাবে তুমি বাধা দিলে, বা প্রতিশোধ লইলে; ইহা তোমার 'তেজ' বৃত্তি। ক্রোধী ব্যক্তি পশু তুল্য, তেজস্বী ঈশ্বর তুল্য।

**পারুণ্য।** মানে বর্বরতা এবং নিষ্ঠুরতা। যুক্তি নাই, অধিকার নাই, হয় তো বা প্রয়োজনও নাই তবু লোককে বা সমাজকে পীড়ন ও অশান্তি দিবার অনুষ্ঠানের নাম বর্বরতা। বর্বর রাজারা শক্তিশালী পশু মাত্র। যাহারা নিজেরা বর্বর তাহারা ঈশ্বরকেও বর্বর প্রস্তুত করিয়া ধর্মশাস্ত্র প্রস্তুত করে। এবং ধর্মের নামে বর্বরতা করে, ধর্মের নামে বা 'ইজম' এর আবরণে এই পৃথিবীতে বর্বরতা যথেষ্ট হইতেছে।

দেবতা বিজ্ঞানের ইহাই মূল বিজ্ঞান। এই পৃথিবীতে তাঁহারা দেবতা হইয়াছেন, যাঁহারা উক্ত দৈবী ভাবগুলিকে নিজের জীবনে দেখাইয়াছেন। যাঁহাদের চরিত্র জগতমঙ্গলের অনুকূল এবং জগতের অমঙ্গলকারী অঙ্গরদের বিরোধী তাঁহারা দেবতা। সূর্য্য, চন্দ্র, নদী, বাতাস, অগ্নি শত শত প্রকারে আমাদের মঙ্গলের কারণ বলিয়া তাহারাও আমাদের দেবতা। যাহারা আঙ্গরিক প্রকৃতির মানুষ তাহারা পশুতুল্য। তাহারা এই সব মঙ্গলকর কারণগুলিকে কখনও দেবতা বলিয়া স্বীকার করে না। যদি তাহারা এসব বস্তুতে দেবত্ব আরোপ করে তবে তাহাদের মনের আঙ্গরিক বৃত্তি কমিয়া যাইবে। তাহারা এ জগতে আসিয়াছে গুণামি করিতে, কাজেই ইহারা কিছুতেই দেবত্ব মানিতে পারে না। তোমরা এ সব লক্ষণ দ্বারা মানুষ চিনিবে এবং সাবধানতা ও শক্তি অর্জন করিবে।

সূর্য্য, চন্দ্র, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, হিমালয় আদিকে কেবল মঙ্গলময় 'প্রকৃতি' জ্ঞানেই দেবতা মনে করি না। তাঁহারা আমাদের অন্তরের বা শরীরের এক একটি মূল্যবান অংশ। যাহাতে এ সব মূল্যবান অংশগুলিকে আমরা সতেজ ও কর্মঠ রাখিতে পারি এ

জন্ম নানা প্রকার প্রক্রিয়া যোগশাস্ত্রে এবং সঙ্ক্যাপূজাদি বিধানে আছে। যেমন সূর্য্য = চক্ষু (optic nerve)। চন্দ্র = মন, গঙ্গা = ইড়ানাড়ী, যে নাড়ীতে জ্ঞানের প্রবাহ হয়। যমুনা = পিঙ্গলা। সরস্বতী = স্কুম্বা। হিমালয় = স্কুম্বা পথ স্কুম্বা এক প্রকার পদার্থে পূর্ণ থাকে, এ জন্ম এই স্কুম্বার একটা অবস্থায় নাম হিমালয়। মেরুদণ্ডকে পর্বত বলে। কতগুলি অস্থির পাব্ বা পর্বের ইহা প্রস্তুত বলিয়া ইহার নাম পর্বত। হিমালয় পর্বত। স্কুম্বা পথ স্কুম্বা মার্গ = মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ড বা হিমালয়ই সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি আদির আশ্রয়। কারণ ইহাতেই সবগুলি কেন্দ্র ও নানাপ্রকার উচ্চভাব পূর্ণ নাড়ীমণ্ডল বিদ্যমান। এই সব দেবতার উপাসনা অর্থে ইহাই বুদ্ধিতে হইবে যে শরীরের সমস্ত মূল্যবান অংশগুলির সাহায্যে তোমাকে জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি অর্জন করিতে হইবে এবং উহাদের পবিত্রতাও রক্ষা তোমাকে করিতে হইবে।

নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম ও দেবতা সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট করিয়া লও। যথা - ব্রহ্ম নাড়ীই ব্রহ্মা বা আত্মা। তোমরা যতই বেদান্ত পাঠ কর না, যতক্ষণ যোগের ক্রিয়া দ্বারা মনকে ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশ করাইতে পারিবে না ততক্ষণ তোমাদের মনের অবস্থিত দৈন্য ভাব নষ্ট হইবে না। এই জন্ম ব্রহ্ম নাড়ীই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এই ব্রহ্মনাড়ীর মস্তিস্কস্থিত অংশে পাঁচটি কেন্দ্রই পাঁচটি সগুণ ব্রহ্ম যথা- গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং ইহাদের সমষ্টিই শক্তি বা দুর্গা।

লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক, ইত্যাদিরা কোন্ দেবতা, ইত্যাদি প্রশ্ন মনে উঠিবে। বিষ্ণু স্তরের শক্তি = লক্ষী। বিষ্ণু সমাজ পালনকারী খণ্ড ঈশ্বর। সমাজ রক্ষার জন্ম অন্ন, বস্ত্র বা ধনের প্রয়োজন; এজন্য লক্ষী বিষ্ণু শক্তিরই একটা অংশ। সরস্বতী = জ্ঞান শক্তি। ইনি শিবস্তরের শক্তি। বেদ বেদান্ত দর্শন যোগ তন্ত্রাদির সমষ্টি। কার্তিক = ইনি বীরত্বের প্রতীক; তেজরূপ দৈবী ভাব। ইন্দ্র = অস্তুর নাশক ও স্কুথের যুগ প্রতিষ্ঠাপক নেতা ও রাজার প্রতীক, ইহা 'তেজ' এর প্রতীক। প্রাণ = বায়ু। রুদ্র = মনের ও শরীরের উচ্চতা। অগ্নি = তেজ, ক্ষুধা, জঠরাগ্নি।

তোমরা যখন ছান্দোগ্য উপনিষদ পাঠ করিবে তখন দেখিতে পাইবে বহুপ্রকারের উপাসনার উপদেশ উহাতে বিদ্যমান। কিন্তু সব উপাসনাকেই 'ওঁ' মন্ত্রে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। তোমরাও এক ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানে এবং 'ওঁ' মন্ত্রে সব প্রকারের উপাসনা করিতে পারিবে। তাহার পর ধীরে ধীরে মন যখন ক্রমশঃ উন্নত জ্ঞানভূমিতে উঠিতে থাকিবে তখন দেবতা, অস্তুর, গন্ধর্ব্ব, সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম সবই ঠিক ঠিক বুদ্ধিতে জানিতে পারিবে। তখন ইহাও বুদ্ধিতে পারিবে শরীর তত্ত্বের ও মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম জ্ঞান লাভই ব্রহ্মজ্ঞান এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অস্তুর, সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম সবই মনস্তত্ত্বের স্তর মাত্র। উহার জ্ঞান ভিন্ন আমাদের তৃপ্তি হয় না এবং আমাদের সমাজধর্ম্ম, রাজ ধর্ম্ম, শিক্ষা বা কোন কার্য্যই মানুষের মঙ্গলের অনুকূল হইয়া পরিচালিত হইতে পারে না।

সিঙ্কুর জল নদে ও খালে একই সিঙ্কুর জল। এইরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম ও দেবতা একই ব্রহ্মের বিস্তার মাত্র। তোমরা যে কোন মন্দিরে যাইয়া ওঁ গায়ত্রী ও ব্রহ্মস্তুত্র দ্বারা এবং ব্রহ্ম নাড়ী ধ্যান করিয়া জল, ফুল, দীপাদি দান করিয়া পূজা করিতে

পারিবে অথবা বিভিন্ন দেবতার নির্দিষ্ট নাড়ীও ধ্যান করিতে পারিবে। তোমরা দেবতার উপাসনা বুঝিলে, এবার পিতৃ উপাসনার কথা শোন।

## পিতৃ উপাসনা

মাতা পিতা; তাঁহাদের মাতাপিতা ক্রমে যদি আমরা পূর্ববর্তীগণের উর্দ্ধ ধারার আলোচনা করি তবে দেখিতে পাইবে, আমাদের জন্ম কোন না কোন ঋষি হইতে আসিয়াছে। ঋষিগণ সকলেই প্রজাপতির মানস পুত্র। এই প্রজাপতি ব্যাপক ঈশ্বরের নিম্নতম স্তর। ইঁহাকে সমষ্টির মানস ভূমি বলা যায়। এই প্রজাপতির উচ্চতর স্তরের নাম হিরণ্যগর্ভ বা বিষ্ণু। এই হিরণ্যগর্ভকে সমষ্টির চিত্তভূমি বলা যায়। এই হিরণ্যগর্ভ হইতে উন্নততর স্তরের নাম রুদ্র বা শিবস্তর। এখানে সমস্ত জীবের অহংগুলি এবং পঞ্চমহাভূতের সূক্ষ্মতম কণাগুলি (পঞ্চতন্মাত্রা) অণু বা বিন্দুরূপে অবস্থান করে। এই শিব ভূমির উপরের স্তরের নাম শক্তিস্তর বা ব্রহ্মস্তর বা পুরুষোত্তম স্তর। হিরণ্যগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া শক্তিস্তর পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরেরই আবার স্তরভেদ আছে। তা যাহাই থাকুক, কিন্তু তোমরা এতটাই জানিয়া রাখ যে এই যে আমি ও তুমি এবং আমার ও তোমার শরীর এখানে আছে; ইহা এক অনাদি ব্রহ্মশক্তির অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিণতি। আমি, তুমি ও আমাদের পিতামাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মশক্তি পর্যন্ত এই যে সৃষ্টির ক্রমধারা এই ক্রমধারার নাম পিতৃজগৎ। তর্পণে এবং শ্রাদ্ধে এই ধারারই উপাসনা হইয়া থাকে।

সিঙ্কুর জল এবং সিঙ্কুসংযুক্ত ঐ খালের জল একই জল। যাহারা খালের ধারে থাকে তাহারা নৌকায় চড়িয়া ধীরে ধীরে সিঙ্কুতে যাইয়া পৌঁছিতে পারে। ঠিক এইরূপ সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মাগণ ব্রহ্ম জ্ঞানের স্তরে থাকেন। যঁাহারা তাঁহাদের অপেক্ষা একটু কম জ্ঞানী তাঁহারা দৈবী সম্পদ বা দেবতা ভাবের ধারা ধরিয়া ব্রহ্ম জ্ঞানের কতকটা আভাস লাভ করেন। যঁাহাদের দৈব ভাব কম তাঁহারা শরীরের ধারা ধরিয়া অর্থাৎ পিতৃধারা ধরিয়া ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হন। পিতৃধারা যেন সিঙ্কু-খালেরই প্রশাখা।

যঁাহারা রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ও বিজ্ঞান নীতির কেন্দ্র ধরিয়া অবস্থিত এবং এক একটা শক্তিশালী পুরুষ; তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের খণ্ড শক্তির ধারাতে অবস্থিত জানিবে। রাজনীতি = শক্তিস্তর। ধর্মনীতি = শিবস্তর। সমাজনীতি = বিষ্ণুস্তর। শিক্ষানীতি = সূর্য্যস্তর। বিজ্ঞাননীতি = গণেশ। এইরূপ মানুষ খণ্ড ঈশ্বরীয় শক্তিতে শক্তিশালী। ইঁহাদের নিম্নে দৈব ভূমির ধারা।

আমরা যে কোন ধারা ধরিয়াই ব্রহ্ম জ্ঞানের পথে চলি না কেন; সব ধারাতেই আমাদেরকে ঐ ব্রহ্ম নাড়ীকে কেন্দ্র করিতে হইবে। তবেই আমাদের উপাসনার লক্ষ্য যে ব্রহ্ম উহা সিদ্ধ হইবে।

তোমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার যে মুসলমানেরা ও খ্রীষ্টানরা আল্লাহ বা গডের উপাসনা করে উহা কি? উত্তর - উহাদের উপাসনার সঙ্গে কোনই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি নাই। উহারা উপাসনা করে ইহুদি কল্পিত একটি কল্পনার ধারাকে। কুরানের আল্লাহ

এবং বাইবেলের গড একই বস্তু। কুরান এই বিষয়ে বাইবেলের নকল করিয়াছে। প্রজাপতি অর্থে সমষ্টি মন। কাজেই ইহারা সমষ্টিমনেরও উপাসক নহে। ইহারা কোন ব্যক্তি বিশেষ ইহুদির কোন কল্পনা বিলাসের উপাসক। ইহা এত যুক্তিহীন কল্পনা যে ইহাতে দৈবী ভাবও স্থান পায় নাই। কুরানে একমাস রুজা রাখার আদেশ আছে। উহাতেও ব্রহ্মচর্যের বা সংযমের অংশ বাতিল। সেখানে অবাধ ভোগের আদেশ আছে। কাজেই শরীরশুদ্ধির বিজ্ঞানও বাতিল করা হইয়াছে। কোন প্রকার শুদ্ধি উহা দ্বারা অসম্ভব। কেহ কেহ গীতার “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং” প্রমাণ দ্বারা কল্পনা বিলাসকেও সমর্থন করেন। আমরা বলিতে পারি আর্য্য দার্শনিক ধারার সঙ্গে ‘গড’ বাবা বা আল্লাহ্ মিঞার কোনই মিল নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বর, দেবতা, মহাপুরুষ বা প্রেত কাহারও সঙ্গে গড্ বা আল্লাহ্ মিল নাই। গীতার ঐ উক্তি ও পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি দেখ। ভ্রান্ত ধারণার স্পর্শা থাকিবে না। উহাতে পিতৃ, দেবতা, ভূত ও ব্রহ্মোপাসনারই কথা আছে।

পিতৃধারার মধ্যে দিয়া যে ব্রহ্মোপাসনা, উহাতে শরীরের শুদ্ধতা বৃদ্ধি হয়। এজন্য শ্রাদ্ধ তর্পণাদিতে দীর্ঘ সময় ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিতে হয়। তোমরা মনে রাখিবে ব্যায়াম, স্বাস্থ্য রক্ষার বিধিপালন ও ব্রহ্মচর্য্য ধারণ দ্বারা শরীরশুদ্ধি ব্রহ্ম জ্ঞানেরই একটা অঙ্গ। ইহাই পিতৃধারার ব্রহ্মোপাসনা। (শরীর শুদ্ধির জন্য ব্যায়াম বিষয়ক একটা অংশ এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে)।

পিতৃধারার শরীর শুদ্ধি, দৈবী ধারায় ভাবশুদ্ধি, শক্তিধারায় সগুণ ব্রহ্মধারায় নীতি শুদ্ধির পথে আমরা একই ব্রহ্ম শক্তির উপাসনায় ব্রতী। যাঁহারা সোজা ব্রহ্মজ্ঞানের পথে ব্রতী তাঁহারা যোগাভ্যাস ও বিচার দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিয়া ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেন। আমাদের শাস্ত্রে পিতৃধারা, দৈবধারা, শক্তিধারা এবং আত্মশুদ্ধি, সব পথেরই অনুশীলন সকলকে করিতে হয়। তোমরা এ সব ধারা সম্বন্ধে যত আলোচনা করিবে ততই হিন্দু ধর্মের বিজ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। গড্ ও আল্লাহ্ মিঞার উপাসনার সঙ্গে শুদ্ধিবিজ্ঞানের কোনই সম্পর্ক নাই। তোমরা কোরান ও বাইবেল পড়, সব বুঝিতে পারিবে।

## প্রেত উপাসনা

প্রেত উপাসনা বুঝানো একটু জটিল হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রে যখন উহার বিধান আছে তখন এ সম্বন্ধেও বলিতে হইবে। প্রেত সম্বন্ধে অত্যধিক কিংবদন্তী সমাজে প্রচলিত, কাজেই প্রেতের আলোচনায় অনেকে ভীত হয়। বলা প্রয়োজন, ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই।

মানুষের মৃত্যুর পর শরীরটা থাকিয়া যায়। এবং শরীরের উপাদান নিজ নিজ পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু আত্মটার সেইরূপ হয় না। উহা অমরই থাকিয়া

যায়। একটা মানুষকে তুমি এখন যেরূপ দেখিতেছ মৃত্যুর পর তাহার স্থিতি ঠিক সেইরূপই থাকে, কেবল বিশেষ এই যে ‘শরীরটা আলাদা হইয়া যায়।’ তাহার শরীরের আকার, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, বিবেক সেই আত্মাটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত থাকে। এইরূপ শরীর ত্যক্ত আত্মার যদি ভোগ, মোহ এবং কামাদির বিশেষ প্রবল আকর্ষণ থাকে তবে সে এই পৃথিবীর খুব নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। তাহারা যতক্ষণ তাহাদের শরীরহীন অবস্থার সহিত নিজেদের স্বভাবকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে না পারে ততক্ষণ প্রেত বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ স্থিতিতে আত্মারা বেশ কষ্ট পাইয়া থাকে। কাজেই মৃত্যুর পূর্বেই সকলের কর্তব্য যথেষ্ট জ্ঞানানুশীলন করা যাহাতে এইরূপ অবস্থা ভোগ করিতে না হয়। এইরূপ অবস্থায় স্থিত প্রেতগণকে অত্যন্ত নিম্ন স্তরের প্রেত বলিয়া জানিবে। ইহারা নিজেদের স্থিতিতে এত উদ্বিগ্ন যে কাহারও ইষ্ট বা অনিষ্ট করার শক্তি ইহাদের থাকে না। কাজেই এসব প্রেত হইতে কোনই ভয়ের কারণ নাই। ব্রহ্ম-দৈত্য ও অপমৃত্যুদের অনেকে এইরূপ প্রেত হয়। ইহারাও নিম্ন শ্রেণীর প্রেত। নিম্ন স্তরের অশিক্ষিত লোকেরা এইরূপ প্রেতের খুব উপাসনা করে। প্রেত উপাসকদের মধ্যে ভণ্ডের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। ইহারা মিথ্যা কথা বলিয়া অনেক লোকদের ভুলাইয়া ঝাড় ফুক করিয়া করিয়া ভাল উপার্জন করে। অনেক মুসলমানকেও এইসব ভণ্ডামীর ব্যবসা করিতে দেখা যায়। তোমরা এইসব ভণ্ডগণ সম্বন্ধে সর্বদা কঠোর থাকিবে। মহরম বাদী মুসলমানের মধ্যে এইরূপ অনেক ভণ্ড চিকিৎসক আছে। মহরম, কবর উপাসনা বা প্রেত উপাসনারই একটা অনুষ্ঠান। নিম্নস্তরের প্রেতের কথা বলা হইল এবার উন্নত স্তরের প্রেতদের কথা বলা হইবে। নিম্নস্তরের প্রেত উপাসনায় কোন লাভ নাই।

ইতিপূর্বে তোমাদিগকে ঈশ্বর জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের কথা বলা হইয়াছে। যথা- (১) প্রজাপতি স্তর বা সমষ্টি মন। (২) হিরণ্যগর্ভের স্তর বা সমষ্টি চিত্ত বা বিষ্ণু। (৩) তান্মাত্রিক স্তর (শিব স্তর), (৪) শক্তি স্তর। পূর্বে বলিয়াছি প্রত্যেক স্তরের মধ্যেই অনেক শাখা স্তর আছে। এসব প্রত্যেক স্তরেই আত্মাগণ অবস্থান করে। আমাদের মন যত উন্নত স্তরে থাকে, আমাদের মনের জিয়ার সঙ্গে তত উন্নত স্তরের আত্মাগুলির সংযোগ হয়। এইসব আত্মা আমাদের বিচার, বিবেক, ত্যাগ, যোগ, বীরত্ব, আত্মজ্ঞান ইত্যাদি অনেক বিষয়ে আমাদের অলক্ষিতে সাহায্য করেন। অনেক সময় অনেক বিষয়ের মীমাংসার সহায়ক হন।

একমাত্র দুর্গাপূজার মস্ত্রে উন্নত স্তরের ভূত পূজার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গাপূজার এই অংশকে ভূতপূজা বলে। উন্নত স্তরের ভূত পূজার বেশীর ভাগ মন্ত্রই বেদ হইতে সংগৃহীত।

এমন অনেক মূর্তিপূজক সাধক আছেন যাহারা খুব সজ্জন এবং ভক্তিমান, কিন্তু ব্যাপক ঈশ্বরের তত্ত্ব জানেন না। তাঁহাদের ধারণা ঐ মূর্তিই ঈশ্বর। ইহাদের ভক্তির প্রভাবে অনেক সময় উন্নত স্তরের আত্মারা অভীষ্ট মূর্তি ধারণ করিয়া দর্শন দেন। অনেক ভক্তিমান সাধক ও মূর্তি উপাসক মূর্তিধ্যান করিতে করিতে শরীর ত্যাগ করেন এবং সেইরূপ দেব বা দেবী মূর্তি ধারণ করিয়া দেব মন্দিরে বা সেইরূপ স্তরে অবস্থান করেন। এইসব আত্মাগণও ভক্তগণকে দর্শন দেন। এইরূপ প্রেতদের শক্তি খুব বেশী নয়; কাজেই তোমরা সবসময় দার্শনিকতা, যুক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইবে। অনেকে

নিজের সমাধি বা কবরের নিকট প্রেত হইয়া অবস্থান করেন এবং বহুকাল পর্যন্ত নিজের প্রভাব জাহির করিয়া ভক্তি পূজাদি আদায় করেন। অনেক সময় অনেক শক্তিশালী নেতার দ্বারা অপ্রত্যাশিত সাংঘাতিক ভুল হইয়া একটা জাতের সর্বনাশ হইতে দেখা যায়। হিটলারের জীবনে ঐরূপ ভুল হইয়াছিল। ইহা যে মনের উপর ভূত জগতের প্রভাব সন্দেহ নাই। কালী, কৃষ্ণ, গড ও আল্গার দর্শনকারী অনেকেই প্রেতদর্শক মাত্র।

তোমাদিগকে প্রচলিত সব রকম উপাসনার রহস্যই বলা হইল। তোমরা সব সময় ব্রহ্মোপাসনার বিকাশ লক্ষ্যে অগ্রসর হইবে। (১) স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্রহ্মচর্যের বিধান ও ব্যায়াম দ্বারা শরীর শুদ্ধ রাখিবে। (২) দৈবী সম্পদের অনুশীলন দ্বারা মনের তেজস্বিতা ও উদারতা বৃদ্ধি করিবে। (৩) সঙ্ঘবদ্ধ থাকিয়া উন্নত নীতিজ্ঞান সংসারে প্রতিষ্ঠা করিবে। এবং আঙ্গুরিকগণকে কঠোরভাবে দমন করিবার পথ করিবে (৪) ব্রহ্ম নাড়ী ধ্যানযোগে যোগানুশীলন দ্বারা আত্মশুদ্ধি আয়ত্ত করিয়া আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে অগ্রসর হইবে। (৫) উন্নত প্রেতজগৎ তোমাদিগকে আপনিই সাহায্য করিবে; সেজন্য কোন উপাসনার প্রয়োজন হয় না। দুর্গামূর্তি, কালী, তারা আদি দশ মহাবিদ্যার মূর্তি ও অন্যান্য বহু প্রাচীন মূর্তিতে বিশেষ শ্রদ্ধা রাখিবে। যথা বিধিতে শক্তিপূজা করিবে। তাহাতে উন্নত স্তরের ভূতগণ তোমাকে সাহায্য করিবেন। যে কোন মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজ বিপ্লবকালে মহাশক্তির পূজা করিয়া নেতাগণ নিশ্চয়ই শক্তি অর্জন করিতে চেষ্টা করিবেন। মহাশক্তির পূজা বিধি এবং মূর্তিগুলি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক আবিষ্কার।

## শীতলা মূর্তি

ইতিপূর্বে তোমাদিগকে মহাবীর হনুমান এবং শিব ও নারায়ণের মূর্তির কথা বলিয়াছি। আমাদের দেশে দুইরকম মূর্তি আছে। (১) যন্ত্রমূর্তি। (২) শিল্প মূর্তি। শিব লিঙ্গ, নারায়ণ শিলা, পতাকা, এসব যন্ত্রমূর্তি। তন্মধ্যে অসংখ্য যন্ত্রমূর্তির ব্যবস্থা আছে। তোমরা দুর্গা পূজা ও কালীপূজায় যন্ত্র আঁকিবার বিধান দেখিলে সব বুঝিতে পারিবে। শিল্পমূর্তিগুলিতে হাত, পা, চক্ষু, মুখ সব থাকে।

তোমরা শীতলা মূর্তি দেখিয়াছ। বসন্তের প্রকোপ হইলে এই মূর্তি গড়িয়া মহাশক্তির আরাধনা করা হইয়া থাকে। একটা গর্দভ, একটা কুলা, একটা ব্যাডু, একটা জলপূর্ণ কলসী ও একটি মহামান্য শক্তিমূর্তি উহাতে দেখিতে পাইবে।

গর্দভ প্রাচীনকালে সহরের বা গ্রামের কুড়া ফেলিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। এইজন্য অর্ছিত পশু এবং ইহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে। ইহাদের অনেক গুণ আছে। এই জীব গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত শীতল থাকে। ইহাদের শরীরে গ্রীষ্মের তাপ লাগে না। ইহাদের বলন্ত রোগও হয় না।

কুলা - পথের ময়লা ও আবর্জনা উঠাইবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। আজকাল টীনের কুলা মিউনিসিপ্যালিটি ব্যবহার করে।

ঝাড়ু - বাড়ী, ঘর, রাস্তা, দেওয়াল পরিষ্কার করিবার বিখ্যাত অঙ্গ।

জলপূর্ণ কলসী - নর্দমা ও পচা স্থান ধুইবার জন্য জল ও ঝাড়ুর প্রয়োগ কিভাবে করিতে হয় ইহা তোমরা জান।

শক্তিমূর্তি- ইহার অর্থ নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগে বাড়ী, ঘর, রাস্তা সহর ঐ সব অঙ্গ সাহায্যে পরিষ্কার করিবে। ইহা দ্বারা বসন্ত নিবারণ হয়।

কি ভাবে এই শীতলা মূর্তি আবিষ্কার হইয়াছিল ইহা আমরা জানি না। আমাদের মনে হয় কোন যুগে কোন শ্রেষ্ঠা মহিলা কোন সহরে বা গ্রামের মহামারী কালে এই সব যন্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা জনপদ পরিষ্কার করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আদর্শ এতই কৃতকার্য হইয়াছিল যে তিনি যখন যে গ্রামে যাইতেন এবং পরিষ্কার করিতেন সেই গ্রামই রোগ মুক্ত হইত। পরবর্তী যুগে লোকে তাঁহার আদর্শে বাড়ীঘর পরিষ্কার করিয়া এই মহীয়সী মহিলার মূর্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই মহাশক্তির পূজা করিয়াও ঐ ফলই পাইতে লাগিল। তোমরা মহাশক্তির আরাধনা কালেও গায়ত্রী, ব্রহ্মনাড়ী ধ্যান ও ব্রহ্মসূত্রাদি পাঠ করিবে। কারণ ইহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তির আরাধনা। কালী, দুর্গা প্রভৃতি শক্তিমূর্তিগুলিও ঠিক এইরূপ সমাজ সেবায় শ্রেষ্ঠ আদর্শ জ্ঞাপক মূর্তি। সমাজ সেবা ও ঈশ্বরোপাসনা এক, সকল শক্তি উপাসনায় ও মূর্তি বিজ্ঞানে এই কথাই প্রচার করা হইয়াছে। ধ্যান, জ্ঞান ও যোগের সঙ্গে সমাজ সেবার শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী আদর্শ তুমি অবলম্বন কর। ইহাই ঈশ্বর ভক্তি।

আমাদের দেশে গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি, রাগ, রাগিনী, যোগাদিরও মূর্তি আবিষ্কার করা হইয়াছে। তোমরা বাড়ীতে দশ মহাবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া এসব মূর্তি রাখিবে এবং প্রত্যেকটির রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবে।

## অঙ্গ প্রতীক (কৃপাণ)

শিব, নারায়ণ ও শীতলা মূর্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এবার তোমাদিগকে অঙ্গপ্রতীক সম্বন্ধে কিছু বলিব। ত্রিশূল, কৃপাণ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অঙ্কুশ, নাগপাশ, যক্ষী, ঘণ্টা, বীণা প্রভৃতিকে অঙ্গ প্রতীক বলে। তোমরা দুর্গাপূজা দেখিলে দেখিতে পাইবে, অনেক অঙ্গ প্রতীকের পূজার বিধান আছে। এক একটী অঙ্গ এক একটী দেবতার স্বরূপ। যেমন কৃপাণ = মহাশক্তি দুর্গা = তেজ। ত্রিশূল = শিব (শান্তি বা জ্ঞান)। চক্র = বিষ্ণু (সংগঠন, প্রেম)। অঙ্কুশ = গণেশ (পশুত্বকে নিয়মে রাখা, সংযম)। দেবতা পূজা অধ্যায়ে দেখিতে পাইবে দৈবী ভাব ও অঙ্গের ভাবের আদর্শ লইয়া জগতের কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ভর করে। অঙ্গ প্রতীক বিশেষ বিশেষ দৈবীভাব মাত্র। বিষ্ণু, শিব ও শক্তিস্তরে এক এক প্রকারের দৈবীভাব অত্যন্ত প্রবল হয়। এজন্য এক একটী অঙ্গকে এক এক প্রকার শক্তিরূপে মানা হইয়া থাকে। তোমরা প্রাচীন হিন্দু সমাজের ইতিহাস এবং মধ্যযুগের হিন্দুদের উত্থান পতনের সব ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, কৃপাণকে সব স্থানেই বড় উচ্চ প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক রাজাদের গৃহে এই কৃপাণের পূজা হইত। এবং এই কৃপাণের অন্য নাম ছিল 'ভবানী'। এখনও আমাদের দেশে বহু উচ্চ প্রতিষ্ঠা বংশে কৃপাণের পূজা হইয়া থাকে। দেশের কস্মিগণ ও তোমরা এই কৃপাণ

প্রতীককে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে জাগাইয়া তুলিবে। কৃপাণের সামনে উপাসনা করিলে উপাসনা বেশী শক্তিশালী হইয়া থাকে। কাজেই তোমরা উপাসনার সময় স্তুতি থাকিলে উহার সামনেই উপাসনা করিবে। ইহার দ্বারা তেজস্বিতা এবং সমাজ জীবনের একতা বৃদ্ধি হয়। তোমরা শিবাজীর ‘ভবানীর’ নাম শুনিয়াছ। কথিত আছে এই ‘ভবানী’ এত শক্তিশালী ছিল যে ইহার প্রভাবে শিবাজী সহজে যুদ্ধ জয় করিতে পারিতেন। রামদাস স্বামী কৃপাণকে শিবাজীর প্রিয় করিয়া দিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দ এই কৃপাণকে শিখ সমাজের রক্ষক করিয়াছিলেন। নেপালী ক্ষত্রিয়গণ এই কৃপাণের প্রসাদে আজও স্বাধীন জাতির সম্মানে সম্মানিত। কৃপাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত ক্রমবিকাশ নামক গ্রন্থে দেখিবে। কৃপাণে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, অবতার, মহাপুরুষ এবং যে কোন দেবতার পূজানুষ্ঠান করা যায়। প্রত্যেক মন্দিরে কৃপাণ প্রতীক রাখিবে। কৃপাণ উৎসব এবং কৃপাণ শোভাযাত্রা বাহির করিবার জন্য বিজয়া দশমী (বাসন্তী ও শারদীয়া) প্রশস্ত দিন। আত্মবিকাশের পথে মানুষ যখন ঠিক আত্মজ্ঞান লাভ করেন তখন তাঁহার কার্য্য দ্বারা সমাজ রক্ষা এবং অস্বস্তি ও বর্বরতা বিনাশের আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কৃপাণের কর্ম্মবিজ্ঞানে ইহাই আদর্শ। এই গণতন্ত্রের যুগে বহুকর্ম্মী সমাজের স্ত্রু ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং বর্বরতা ও আত্মরিকতাকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার এইরূপ কৃপাণ আদর্শ গ্রহণ করিলেই সমাজের মঙ্গল হইবে। দুর্গাপূজায় বলিদান এই খড়্গেরই পূজা। পৌরোহিত্যবাদীরা বলিদানটাকে দক্ষিণা ও ঘুষ দানের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়া ইহার মহান আদর্শ খর্ব্ব করিয়াছে। নিজের মধ্যস্থিত মহাশক্তিকে রাজস ভাবে জাগাইয়া তোলে। এই বিজ্ঞানে সমাজ গড়িয়া লও; ইহাই বলিদান, ইহাই কৃপাণ পূজা। ছাগ বলি উহার একটা বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র। ছাগ বলি না দিলেও উহা কেবল গায়ত্রী উপাসনা দ্বারা জাগানো যায়। ভাববাদীরা বলিদান সম্বন্ধে অনেক অবাস্তুর কথা প্রচার করিয়াছেন এবং নিজেদের অদূরদর্শিতা, মূর্খতা ও ভীরুতার চরম নিদর্শন দেখাইয়াছেন। পৌরোহিত্যবাদীরা এই বলিদান ব্যাপারে দক্ষিণা আদায় স্বগম করিবার জন্য ঈশ্বরকে ঘুষ খোর প্রস্তুত করিয়াছে। তোমরা কৃপাণ পূজা দ্বারা, বীরত্ব ও একতা অর্জন করিও। মনে রাখিও যাহারা ভীরু, যাহারা নিস্তেজ, তাহারা হিন্দু ধর্ম্মের কোন প্রকারেই উপযুক্ত নহে। ইহারা মিথ্যুক এবং চালবাজীকেই নিজেদের অন্তরে ধর্ম্মের নামে স্থান দিয়াছে। যঁাহারা তেজস্বী, তাঁহারা সত্যবাদী, ত্যাগী, যোগী, জ্ঞানী ও মহান হইতে পারেন। নারায়ণ শিলা, শিবমূর্ত্তি ও কৃপাণের মধ্যে কৃপাণই তোমাদের জীবনকে বেশী বিকাশে সাহায্য করিবে। জানিয়া রাখিও, আত্মা অমর। আত্মার মৃত্যু নাই। এবং অস্বস্তি থাকিতে আত্মবিকাশ নাই। অস্বস্তি নাশের জন্য যে বীরত্ব ও সমাজ রক্ষায় আত্মদান উহাই ঠিক ঠিক অধ্যাত্মবাদের আদর্শ। জানিয়া রাখিও অস্বস্তি নাশে আত্মার নাশ হয় না – উহার দ্বারা সমাজ নিষ্কলঙ্ক হয় এবং মানুষের বিকাশের অনুকূল হয়। এজন্য কৃপাণ পূজা হিন্দু ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিধান। কৃপাণপূজা বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ওঁ অস্বস্তাসুগ্ বসা পঞ্চ চর্চিতস্তে করোজ্জলঃ ।

শুভায় খড়্গ ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ।

হে চণ্ডিকে, দৈত্যদিগের রক্ত-বসা-পঙ্ক-চর্চিত প্রভাশালী তোমার খড়্গ আমাদের মঙ্গল করুক। আমরা আপনাকে প্রণাম করি।

ওঁ অসির্বিষসনঃ খড়েগ তীক্ষ্ণ ধারো দুরা সদঃ।

শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপালো নমোহস্ততে ॥

দুর্গাপূজা বিধি ॥ অস্ত্র পূজা ২ ॥

হে খড়্গ সর্পের বিষের মত জ্বালাকারী, যাহা অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার, যাহা অপরাজেয়, যাহা ঈশ্বর্যের আধার, যাহা বিজয়ের প্রতীক, হে ধর্ম রক্ষক (খড়্গ), তোমাকে প্রণাম।

কৃপাণকে অস্ত্র, গুণ্ডা, আঙ্গুরিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ চীক চীক কৃপাণ পূজা। উহা না-করিয়া পুঞ্জ-চন্দনে পূজা মানে পৌত্তলিকতা মাত্র।

### উপাসনায় অগ্নি, জল ও ব্রহ্মনাড়ী

তোমরা যখন পূজাপদ্ধতি পড়িবে, দেখিতে পাইবে - সব পূজাতেই যজ্ঞের বিধান আছে। সব পূজাতেই জলের যথেষ্ট প্রয়োগ বিধান আছে। অগ্নি, জল ও ধ্যানাদিসহ মন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগই পূজায় আসল অবলম্বন। অন্যান্য বস্তু ও উপাদান এবং উপচার ও নৈবেদ্যাদি গোণ অবলম্বন, উহা না হইলেও উপাসনা চলে।

**অগ্নি** - 'তেজ' নামক দৈবী সম্পদই অগ্নি। শরীরের মধ্যে মূলাধারে ইহার কেন্দ্র বিদ্যমান। তেজ বৃদ্ধির জন্য অগ্নিকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপাসনার বিধান জানিবে। তোমরা যখন বেদ পড়িবে তখন দেখিতে পাইবে সমস্ত প্রকার দেবতার স্তুতি ও আহুতি মন্ত্রে অস্ত্রের নাশের ও নিজের শক্তি বৃদ্ধির (ধন, জন, অস্ত্র, সংগঠন) কথা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ইহা আমাদের জীবনের একটা প্রয়োজনীয় দিক। জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ও উচ্চ জীবনের সামাজিক আদর্শ হীন হইবার দরুণই অগ্নিহোত্রী পৌরোহিত্যবাদী ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই নিস্তেজ হইয়া থাকেন।

**জল** - যখনই বিস্তারিত সঙ্ক্যা করিবে তখন দেখিতে পাইবে ইহাতে কেবলই জলের প্রয়োগ। সঙ্ক্যা করিবার পরই দেখিতে পাইবে কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে তোমার মন শান্ত হইয়া গিয়াছে। মস্তিষ্কের শিবকেন্দ্রে সোমচক্র বিদ্যমান। জলপ্রয়োগসহ উপাসনা দ্বারা মন উহার সংযোগ লাভ করে।

**ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান** - উপাসনায় অগ্নিই থাকুক বা জলই থাকুক, ধ্যান উভয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। যদি তোমরা উন্নত স্তরের যোগীদের সংস্পর্শে থাক তবে দেখিতে পাইবে তাঁহারা কিরূপ তেজস্বী ও শান্ত। তাঁহারা সর্বদাই ব্রহ্মধ্যানে থাকিয়া শরীর যাত্রা নির্বাহ করেন। জীবনের একসময় অগ্নি ও জলের যথেষ্ট প্রয়োগ দ্বারা তেজ ও শান্তি আয়ত্ত করিতে হয়। পরে ধীরে ধীরে কেবলই ব্রহ্মধ্যানে তাঁহারা সবটাই পাইয়া থাকেন। ইহাদিগকে যদি কখনও যজ্ঞ বা সঙ্ক্যা বা উপাসনা করিতে দেখিতে পাও, দেখিবে, দিব্য তেজ ছটায় বা শান্তির ধারায় ইহাদের মুখ চক্ষু ভরিয়া গিয়াছে। 'অগ্নি'

কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। ‘জল’ উপাসনা কাণ্ডের কেন্দ্র। ‘ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান’ জ্ঞানকাণ্ডের কেন্দ্র। উপাসনায় এই তিনটি বস্তু আমাদের কাছে তিন দিকে পুষ্ট করিয়া দেয়, যাহার ফলে জ্ঞান আমাদের সহজে লাভ হয়।

এবার তোমাদিগকে জ্ঞান সম্বন্ধে বলিব।

## জ্ঞান ধর্ম

তোমাদের পক্ষে জ্ঞানধর্ম বুঝা একটু কঠিন হইবে। এই পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুধর্মে জ্ঞানধর্ম বা দার্শনিকতা বিদ্যমান। অন্য কোন ধর্মেই দার্শনিকতা নাই। অন্য ধর্মে ‘কি’ এবং ‘কেন’ প্রশ্ন করিলে বিশ্বাসবাদীরা তোমাকে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া আক্রমণ করিতে আসিবে। কারণ উহার জবাব দিলে ঐ সব ধর্মের ভিত্তিই থাকিবে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সেই কথা খাটে না। তুমি যত প্রশ্ন কর সব প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর হিন্দুধর্মে বিদ্যমান। এজন্য হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানুষ মাত্রই নিজের ধর্মে একটা জন্মগত মোহ থাকে। ধর্মে প্রবল শ্রদ্ধা থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মোহ থাকা কর্তব্য নহে। যদি আমরা সর্বদা জ্ঞানধর্ম ও দার্শনিকতার আলোচনা না করি তবে আমাদের ধর্মজ্ঞান মূর্খ ও বর্বর বা পশুদের সমতুল্য হইয়া যাইবে। কাজেই তোমরা নিজেদের এবং প্রত্যেক অহিন্দু ধর্মেরই দার্শনিকতা ও যুক্তিবাদ আলোচনা করিয়া চলিবে। জ্ঞানধর্মে বিশ্বাসবাদিতা বা ভগ্নমীর স্থান নাই।

এই সৃষ্টি কি এবং কেন? আমি তুমি কি এবং কেন? বালক বৃদ্ধ কি এবং কেন? এই পৃথিবী, গ্রহ নক্ষত্র কি এবং কেন? কেহ পায় বেড়ায়, কেহ উড়ে, কেহ দুই পায়ে হাঁটে; কেহ একেবারে দাঁড়াইয়া জীবন কাটাইয়া দেয়। এসব কি এবং কেন ইত্যাদি প্রশ্নে মানুষের মন সর্বদাই ব্যস্ত হইয়া উঠে। মানুষের কর্ম, মানুষের উপাসনা ও মানুষের রীতি নীতির মূলে ‘কি এবং কেন’ প্রশ্ন জড়িত। ঈশ্বর, জীব, আত্মা, প্রকৃতি সমস্ত বিষয়ে মানুষ যুক্তিযুক্ত জবাব আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু তোমরা আশ্চর্য হইবে যে হিন্দুধর্ম ভিন্ন পৃথিবীর কোন ধর্মেই ইহার জবাব নাই। সর্বরকমের ‘কি’ এবং ‘কেন’ কে মিটাইবার জন্য আমাদের মন ব্যস্ত। মন যাহা দ্বারা এসব প্রশ্নের মীমাংসা করিতে উপাদান পাইবে সেই উপাদানটির নাম ‘জ্ঞান’।

মানুষের ‘জ্ঞান’ মিটাইবার জন্য তিনটি উপায় হিন্দুশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে - (১) অনুভূতি, (২) যুক্তি, (৩) বেদ বা ঋষিবাক্য।

‘অনুভূতি’ বুঝিতে হইলে সমস্ত যোগশাস্ত্র মন্থন করিতে হইবে। এবং যোগাভ্যাস করিতে হইবে। ‘যুক্তি জ্ঞান’ অর্জন করিতে হইলে সমস্ত দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিতে হইবে। এবং ‘ঋষি বাক্য’ বুঝিতে হইলে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে। তবে যোগাভ্যাস ও সাধনার অবলম্বন থাকিলে গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ (কয়েক খানা) ও রুদ্রী (সংহিতার সামান্য অংশ) পাঠ করিলেই চলে। সে সঙ্গে যোগদর্শনখানা আলোচনা করিলে ভাল হয়।

যতই শাস্ত্র পড় না কেন ‘অনুভূতি’ হীন জ্ঞান মনকে তৃপ্তি দিতে পারে না। কাজেই সব জ্ঞানের মূলে ‘অনুভূতি জ্ঞান’। এজন্য প্রথমে সেই সম্বন্ধে সামান্য আভাষ দেওয়া যাইতেছে।

### গ্রন্থিভেদ জ্ঞান

ইতিপূর্বে তোমাদিগকে ব্রহ্মনাড়ী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্মনাড়ীস্থিত মর্মস্থানগুলির নাম ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যং ইত্যাদি। প্রত্যেক মর্মস্থানে কিরূপ মনোবিজ্ঞান অবস্থান করে সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রে আছে (ক্রম বিকাশ অষ্টম অধ্যায় দেখ)। ব্রহ্মনাড়ীতে আমাদের আত্মা থাকিলেও আত্মা আমাদের সোজা পরিচালিত করেন না। যদি আত্মা (ব্রহ্মনাড়ী) আমাদের পরিচালিত করিতেন তবে আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের কর্ম ও চিন্তার ধারা শ্রীকৃষ্ণের মত বা গীতাজ্ঞানের মত হইত। আসল কথা, ব্রহ্ম নাড়ী ঐ সব মর্ম গ্রন্থি দ্বারা আবর্তিত থাকে এবং আমরা এক একজন এক এক প্রকার মর্মগ্রন্থি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকি। কুবাসনা, কুমোহ, কুধর্ম, কুচেষ্টা; আবার উচ্চ লক্ষ্য, অধ্যাত্ম প্রেম, যুক্তিবাদ, স্বধর্ম, স্ববুদ্ধি, বিকাশচেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবাপন্ন মানুষ দেখিতে পাই।

**ব্রহ্ম গ্রন্থি।** ভবিষ্যতের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ভোগের কল্পনায় আমাদের মন ভরপুর থাকে। তোমরা দেখিতে পাইবে, আমরা কত আশা কত কল্পনা করি; তাহার একটাও ফলে নাই; তবুও করিয়া হয়রাণ হই; কল্পনা ত্যাগ করিতেও পারি না। ইহার কারণ মনের এক স্বাভাবিক গ্রন্থি আছে। মন ঐ গ্রন্থিতে বদ্ধ থাকিবার দরুণ ঐরূপ কল্পনা করিতে বাধ্য হয়। ঐ গ্রন্থির নাম ব্রহ্ম গ্রন্থি। নাভিচক্রে এই গ্রন্থি বিদ্যমান। যোগের ক্রিয়া এবং যোগীর সাহায্যে ভিন্ন এইরূপ বৃথা কল্পনার গ্রন্থিভেদ করা কঠিন। এই গ্রন্থিভেদ হইলে মনের যোগশক্তি অর্থাৎ মনের স্বাভাবিক ব্যাপকত্ব অনেকটা আয়ত্ত হয় এবং মনের স্বাভাবিক আরাম বৃদ্ধি হয়। এই গ্রন্থিভেদের পর আমরা কতগুলি বিষয়ে বেশ নিশ্চিত হইতে শক্তি পাই। ভবিষ্যতের বৃথা কল্পনা এই মর্মভেদ হইলে শেষ হয়। ইহাকে মণিপুর গ্রন্থি বলে।

**বিষ্ণু গ্রন্থি।** ব্রহ্মগ্রন্থির রহস্যভেদ হইবার পর কিছু দিন পর্য্যন্ত মন বেশ আরামে থাকে। যদি মোহের সম্বন্ধ কোথাও না থাকে বা ঐরূপ সম্বন্ধ আমরা স্থাপন না করি তবে মনের আরাম যাইবে না। কিন্তু দেখা যায় কোন অজ্ঞাত শক্তির ইসারায় স্নেহ, ভালবাসা বা প্রেমের প্রেরণায় মন কোথাও বদ্ধ হইয়াছে এবং মন তাহার স্বাভাবিক যোগশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। দেখা যাইবে, মনকে কিছুতেই আয়ত্তে রাখা যাইতেছে না। যুক্তি, উপায়, বিবেক, বিচার, সব কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে এবং অন্তঃকরণ ক্ষত বিক্ষত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যোগের অনুশীলন দ্বারা এবং শক্তিশালী যোগী গুরুর সহায়তায় মনের এই গ্রন্থিও ভেদ করা যায়। পূর্বোক্ত ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হইবার পর মন যতটা ব্যাপক ও নির্মল হইয়াছিল এই গ্রন্থিভেদ হইবার পর মনের ব্যাপকত্ব ও নির্মলত্ব আরও বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ মনের আরামময় স্থিতি আরও বৃদ্ধি হইবে। ব্রহ্মনাড়ীর আশ্রয়ে ‘অন্যহত’

কেন্দ্রে এই গ্রন্থি অবস্থিত। ইহা ‘মহঃ’ লোকের গ্রন্থি। ব্রহ্ম গ্রন্থিভেদের পর কিছু দিন মনের স্থিতি এত নির্মল থাকে যে মনে হয় ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। বিষ্ণু গ্রন্থিভেদের পরও মনে হইবে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছু দিন বাদ বুঝা যাইবে এখনও অজ্ঞান গ্রন্থি আছে। ইতিপূর্বে ‘নারায়ণ শিলা’ আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষ্ণু গ্রন্থির কথাই বলা হইয়াছিল। ইহাই হিরণ্যগর্ভ গ্রন্থি। ইহাই হৃদয় গ্রন্থি।

**রুদ্র গ্রন্থি।** বিষ্ণু গ্রন্থি ভেদের পর সাধকের মনোবিজ্ঞানের অনেক রহস্য আয়ত্তে আসিয়া যায়। প্রথমটায় সাধক মনে করে এবার ঠিক ঠিক জ্ঞান ও শক্তি আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুদিন বাদে দেখা যায় এমন অনেক বিক্ষিপ্ত আছে যাহাদের উপর অধিকার মোটেই সাধকদের হয় নাই। তখন কারণ খুঁজিলে দেখা যাইবে ‘অহং’ গ্রন্থি মাঝ খানে থাকিয়া ‘মোহের’ বীজকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এবং মনের ব্যাপকত্ব বাধা পাইতেছে। চেষ্টা দ্বারা ‘অহং গ্রন্থি’ ভেদ হইলে সমস্ত প্রকার পক্ষপাতিত্ব এবং দুর্বলতা হইতে আমাদের মন মুক্ত হয়। এবার আমাদের মন তত্ত্বজ্ঞানের ঠিক ঠিক উপযুক্ত হইল। এবার মন সব রকমের ‘কি’ এবং ‘কেন’ প্রশ্নের ঠিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। এইরূপ সব মর্ষগ্রন্থি ভেদ হইয়া যাইবার পর অনুশীলন দ্বারা সব জ্ঞানই আয়ত্ত করা যায়। সাধুচরিত্র পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে অনেক মহাপুরুষেরই ব্যবহারে বর্ণ বিশেষের উপর পক্ষপাতিত্ব যথেষ্ট বিদ্যমান। ইহাতে তোমরা বিস্মিত হইবে না। কারণ গ্রন্থি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এমন মহাপুরুষ খুব কম আছেন। মস্তিষ্কস্থিত অহং কেন্দ্রকে ভিত্তি করিয়া রুদ্র গ্রন্থি অবস্থিত (মস্তিষ্ক কেন্দ্রে চিত্রে ৪ চিহ্নিত কেন্দ্রে ‘অহং’ অবস্থান করে)। ইহা তপঃ লোকের গ্রন্থি। এই গ্রন্থিভেদে আমাদের ঠিক ঠিক ‘সত্য’ জ্ঞান লাভ হয়। মস্তিষ্কের শিবপিণ্ড ধ্যান দ্বারা এই গ্রন্থি ভেদের শক্তি অর্জন করিতে হয়। ইহার নাম আজ্ঞাচক্র গ্রন্থি।

মর্ষ রহস্য জ্ঞান এবং মর্ষভেদ জ্ঞান দুইই “অধ্যাত্ম জ্ঞান” জানিবে। এইরূপ দুই প্রকার জ্ঞান না থাকিলে জীবন স্কন্দর ও পূর্ণ হয় না। আমাদের জীবন একাধারে এইরূপ দুইটী জীবনের সমষ্টি। মর্ষকেন্দ্র আমাদের জীবনকে কিরূপে পরিচালিত করিতে চায় এবং ব্রহ্মনাড়ী বা আত্মা আমাদের জীবনকে কিরূপে পরিচালিত করিতে চায় এবং ব্রহ্মনাড়ী বা আত্মা আমাদের জীবনকে যেমনভাবে পরিচালিত করে এই দুই এর রহস্য যে জানে সেই জানী। এই সম্বন্ধে বেদ, তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রে বিশদভাবে আলোচনা আছে। আমরা গীতা হইতে কয়েকটি স্কন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। গীতায় এই সব মর্ষকেন্দ্র সংযুক্ত শরীরটীকে ক্ষেত্র বলিয়াছেন এবং ঐ ব্রহ্মনাড়ীই ক্ষেত্রজ্ঞ।

ইদং শরীরং কোন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১৩-১

হে কোন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে। যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ।

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্বি সর্বক্ষেত্রেসু ভারত।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জানং যন্তজ্ জ্ঞানং মতং মম ॥ ১৩-২

হে ভারত, আমাকে (ব্রহ্মনাড়ী বা আত্মাকে) সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যে জ্ঞান উহারই নাম জ্ঞান।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু ॥ ১৩-৩

সেই ক্ষেত্র কিরূপ, উহার বিকার কিরূপ, সেই বিকারে সংযম কিরূপ , উহার প্রভাব কিরূপ সংক্ষেপে উহা শোন।

ঋষিভি বঁহুধা গীতাং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমন্তির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ১৩-৪

ঋষিগণ সেই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ সম্বন্ধে নানাপ্রকারে বেদ মন্ত্রে গাহিয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্র পদে অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরাঃ ॥ ১৩-৫

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রকারের বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ)।

ইচ্ছা দ্বেষঃ স্তথং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ১৩-৬

ইচ্ছা দ্বেষ, স্তথ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা (জ্ঞান), ধৃতি সংক্ষেপে (পূর্ব শ্লোকের বিষয় সহ) ইহাই ক্ষেত্র।

(এই দুইটী শ্লোকের টিপনী লিখিলে এক খানা বড় বই হইয়া যাইবে। তোমরা এসব ক্ষেত্র লক্ষণের কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে জানিয়া রাখ। পঞ্চ মহাভূত - ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ক্ষিতিকেন্দ্র মূলাধারে, অবকেন্দ্র স্বাধিষ্টানে, তেজকেন্দ্র মণিপূরে, মরুৎকেন্দ্র অনাহতে, ব্যোমকেন্দ্র বিশুদ্ধাথে। অহংকেন্দ্র মস্তিষ্কে (মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৪ কেন্দ্রে)। বুদ্ধিকেন্দ্র আজ্ঞাকেন্দ্রে (মস্তিষ্ক কেন্দ্র পরিচয় চিত্রে ৭ কেন্দ্রে)। দশ ইন্দ্রিয়ের সবগুলি কেন্দ্রই শিবপিণ্ডে। বাহিরের জগৎস্থিত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দজ্ঞান বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রথম মস্তিষ্কের বিজ্ঞানময় কোষে যায়। মস্তিষ্কের কোন কোন কেন্দ্রে মনোময় কোষের ক্ষেত্র তোমাদের পক্ষে বুঝিতে কঠিন হইবে (ক্রমবিকাশ দেখ)। ইচ্ছার প্রধান ক্ষেত্র মণিপূরে। দ্বেষ, স্তথ ও দুঃখ হৃদয়ে। সংঘাত প্রাণ কেন্দ্রে হয় (মস্তিষ্ক চিত্রে ৯ কেন্দ্রে)। চেতনা = জ্ঞান (মস্তিষ্ক কেন্দ্র চিত্রে ৫ কেন্দ্রে)। ধৃতি বুদ্ধি কেন্দ্র (মস্তিষ্ক চিত্রে ৭ কেন্দ্রে) এবং শান্তিকেন্দ্র (মস্তিষ্ক চিত্রে ৪ কেন্দ্রে) মিশ্রিত শক্তিতে আসিয়া থাকে।)

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবি ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ১৩-৩৩ ॥

হে ভারত, যে রূপ এক সূর্য্য সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করেন, ঠিক সেইরূপ ক্ষেত্রী (আত্মা) ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজয়োরেবমন্তরং জ্ঞান চক্ষুষা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্য্যাস্তি তে পরম্ ॥ ১৩-৩৪ ॥

যাঁহারা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজের ভেদ জানিতে পারেন এবং যাঁহারা পঞ্চ ভূতের প্রকৃতি ও ইহা হইতে মুক্তির বিজ্ঞান জানেন, তাঁহারা পরম আত্মাকে জানিতে পারেন।

গ্রন্থিজ্ঞান এবং গ্রন্থিভেদ বিজ্ঞানই ক্ষেত্রজ্ঞান। আত্মা এই শরীরে কিরূপ নির্মল ও নির্লিপ্ত উহা যদি তোমরা জানিতে পার তবে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' জ্ঞানও লাভ হইল। গ্রন্থি ও গ্রন্থিভেদ জ্ঞান দুইটি কথার জ্ঞান নহে। ইহা  $২+২=৪$  এর অঙ্ক কষা জ্ঞান। ইহাই জ্ঞানের আসল কথা।

### দার্শনিক জ্ঞান

বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, দৈবীমীমাংসা, কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মসূত্র; এই সাত খানা আমাদের প্রধান দর্শন শাস্ত্র। (ইহা ভিন্ন আরও অনেকগুলি দর্শন শাস্ত্র আছে)। ইহার মধ্যে দৈবী মীমাংসা দর্শন খানা পাওয়া যায় না। ইহার অনুকূলে নারদীয়ভক্তি সূত্র ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র সামান্য অংশ পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রের ভক্তিবাদ ব্যাখ্যা অনেক আচার্য্য করিয়াছেন। কাজেই দৈবী মীমাংসার অভাব পূর্ণ হইয়াছে। কর্ম্মমীমাংসা দর্শন খানা যাগযজ্ঞাদির বিধান ও মীমাংসা দর্শন। বৌদ্ধগণ এই দর্শন খানার বিরোধী ছিলেন। ব্রহ্মণ্যবাদের ভিত্তি স্বরূপ এই দর্শনখানাই পৌরোহিত্যবাদের ভিত্তি হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা জ্ঞান লাভ খুবই কঠিন মনে হয়। জ্ঞানের অনেক ভূমি আছে বলিয়াই দর্শন শাস্ত্রও অনেকগুলি রহিয়াছে; এইজন্য উপাসনা কাণ্ডে সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে।

সাংখ্য, পাতঞ্জল ও ব্রহ্মসূত্রের মোটামুটি জ্ঞান থাকিলে দার্শনিক জ্ঞানের সব কথাই জানা গেল, বুঝিতে হইবে। ইতিপূর্বে গ্রন্থিজ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথা বলা হইয়াছে উহার সবগুলি কথাই এই তিন দর্শনের সার। সাংখ্য মতে সৃষ্টি নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলির সমষ্টি।

- (১) পুরুষ (জ্ঞ)। ইহাই পঞ্চ সগুণ ব্রহ্ম বর্ণিত শক্তি।
- (২) অব্যক্ত (প্রকৃতি)।
- (৩) মহৎ (ব্যক্ত)।
- (৪) অহং তত্ত্ব। সগুণ ব্রহ্মের ইহাই 'শিব স্তর'।
- (৫) পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ)।
- (৬) মন ( মনোময় কোষই মন। ইহার অন্তর্গত মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অভিমান এইরূপ চারিটি ভাগ আছে)।
- (৭) পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম)।
- (৮) দশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং বাক, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু)।

সবগুলি মিলাইয়া ২৫ হইল। ইহাদেরই অন্য নাম ২৪ তত্ত্ব। ইহাদের মধ্যে মাত্র পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ এবং আর সবই ক্ষেত্র। ইহাদের লক্ষণ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইল না। তোমরা জানিয়া রাখিবে এই তত্ত্বগুলির অনুভূতি সবই পূর্বেজ্ঞ সগুণ ব্রহ্মানুভূতির মত ব্যাপক।

পতঞ্জলী এই সব তত্ত্বের উপর আরও একটি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উহার নাম 'ঈশ্বর'। এই ঈশ্বর বলিতে এই ২৪ টি তত্ত্বের সমষ্টিভূত এক তত্ত্ব বুঝাইয়া থাকে।

বেদান্তের শঙ্কর ভাষ্য মতে এই ‘ঈশ্বর’ সগুণ ব্রহ্ম বা সক্রিয় ব্রহ্ম। ইহার অন্য নাম “মায়া উপহিত চৈতন্য”। এই মতে এই ঈশ্বর এবং এই ২৪ তত্ত্ব সবই মায়া এবং ইহাদের অস্তিত্ব নাই। এই মতে এক নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মতত্ত্ব মাত্রই আছেন। সত্যই, ব্যাপক ব্রহ্মতত্ত্ব মানিলে অন্য কোন তত্ত্বই আর মানা যায় না। অর্থাৎ ঠিক ঠিক ব্যাপক একটি তত্ত্বই হইতে পারে। আমরা উপাসনা কাণ্ডে এজন্য সগুণ ব্রহ্ম ও নিগুণ ব্রহ্ম দুই রকম উপাস্য তত্ত্বের বিষয় বলিয়াছি।

কিছু দিন বার বার আলোচনা করিলে তোমাদের এই জ্ঞান অংশ আয়ত্ত হইয়া আসিবে। তোমারা নিজেদের এই ধর্মজ্ঞানকে কঠিন মনে করিও না। তোমাদিগকে সৃষ্টির স্তরগুলি ভাগ করিয়া খুব সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইবে। সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান অংশ দেখ।

**মহামন্ত্র জ্ঞান** - বেদে ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মবিষয়ক বহু মহামন্ত্র আছে। এই মহামন্ত্র-গুলির উচ্চারণ দ্বারা শান্তি ও জ্ঞান উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। মহামন্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবার জন্যই মানুষ ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, সন্ন্যাস ও যোগীজীবন যাপন করেন। কয়েকটি মাত্র মহামন্ত্রের কথা বলা যাইতেছে। তোমরা উপনিষদ উক্ত মন্ত্রগুলি ও মহামন্ত্রগুলি কঠিন করিয়া লইবে। নিত্য উপাসনার শেষে মহামন্ত্রও গাইবে।

১। ॐ তত্ত্বমসি (সাম)। তুমি সেই ব্রহ্ম তত্ত্ব।

২। ॐ প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম। বা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ (খৃক) প্রজ্ঞান এবং আনন্দই ব্রহ্ম।

৩। ॐ অহং ব্রহ্মাস্মি ॥ (যজুঃ) আমিই ব্রহ্ম।

৪। ॐ অয়মাত্মা ব্রহ্ম ॥ (অথর্ক) এই আত্মাই ব্রহ্ম।

৫। ॐ সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম। সব নিশ্চয়ই ব্রহ্ম। এই মহামন্ত্রটি তোমরা জাতীয় ধ্বনিক্রমে প্রত্যেক উৎসবের উদ্দীপনার জন্য উচ্চারণ করিবে।

৬। ॐ সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম ॥

৭। ॐ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম ॥

৮। ॐ সত্যং জ্ঞানং অমৃতং ব্রহ্ম ॥

৯। ॐ সত্যং জ্ঞানং অভয়ং ব্রহ্ম ॥

১০। ॐ তৎ সৎ ॐ ॥

১১। ॐ হরিঃ ॐ। (উপাসনার পর স্তবধা থাকিলে মহামন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিবে)।

## সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান

সৃষ্টির মোটামুটি ৪টা স্তর, যথা -

১। সৃষ্টির শক্তিস্তর।

২। সৃষ্টির বিজ্ঞানস্তর।

৩। সৃষ্টির দৈবস্তর।

৪। সৃষ্টির স্থূলস্তর।

প্রথম সৃষ্টির শক্তিস্তর সম্বন্ধে বলা যাক। এই স্তরের অন্তর্গত তিনটি স্তর আছে।

(ক) নির্গুণ ব্রহ্মস্তর।

(খ) সগুণ ব্রহ্ম। বা মায়া উপহিত চৈতন্য। বা ঈশ্বর। এই স্তরের কতগুলি শক্তিক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকিয়া সর্বদা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কাজ করিয়া চলিয়াছেন।

(গ) অব্যক্ত। অব্যক্ত কিরূপ তত্ত্ব উহা বুদ্ধিতে তোমাদের অঙ্গবিধা হইবে। এতটা জানিয়া রাখ - এক জ্যোতিহীন আবরণ। যাহার এক পারে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম এবং অন্যদিকে সৃষ্টি চক্র বিদ্যমান। এই সৃষ্টির আধারও এই অব্যক্ত।

সৃষ্টির বিজ্ঞান স্তরে মহৎ, পঞ্চতন্ত্র ও আমাদের অহং তত্ত্বগুলি অবস্থান করে। এই স্তরের অন্তর্গত মোটামুটি দুইটা স্তর টানা যায়। (১) মহৎ জগৎ। (২) তন্ত্র জগৎ।

১। মহৎ বা জ্ঞানময় বা ধ্বনিময় বা শব্দব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মস্তরের কয়েকটি শক্তির মিশ্রণে এই জ্ঞানময় জগৎ সৃষ্ট হয়। এই মহতের আশ্রয়ে পঞ্চতন্ত্র ও আমাদের সমস্ত জীবের অহংবীজ সৃষ্ট হয়। পঞ্চতন্ত্রাক্রমণ ও জীববীজকণা এখানে সৃষ্ট মাত্র হয় কিন্তু সেইগুলি এখানে অবস্থান করে না।

২। তন্ত্র জগৎ। এই জগতে আমাদের এবং সৃষ্টির সমস্ত জীবের ‘অহং’গুলি বীজ রূপে থাকে। এবং আমাদের শরীর ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির জন্য যে ক্ষিতি আদি ভূতকণার (তন্ত্র) প্রয়োজন হয় সেইগুলিও থাকে। ইহা শাস্তি জগৎ। ইহা সমস্তির অহং এর স্তর।

**সৃষ্টির দৈব স্তর।** ইহাই সৃষ্টির হিরণ্যগর্ভ। এখানে জীবের বীজগুলি স্লথময় রূপ লাভ করে। একটি বীজে ও একটি অঙ্কুরে যতটা ভেদ, বীজ জগতের জীববীজের সহিত এই স্লথময় জীবের ঠিক ঠিক ততটা ভেদ। এই দৈব সৃষ্টির অন্তর্গত আরও একটি স্তর আছে। উহার নাম প্রজাপতির স্তর। ইহাকে আমাদের সমস্তির মন বলা যায়। হিরণ্যগর্ভ আমাদের সমস্তির চিত্ত বা সমস্তির স্বেথের স্তর। সগুণ ব্রহ্ম অংশে বর্ণিত গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, সবই এই স্তরের অন্তর্গত।

**সৃষ্টির স্কুল স্তর।** ইহাকে সৃষ্টির বিশ্বরূপও বলা যায়। এই পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র এবং আমাদের শরীরের একেবারে স্কুল অংশ এই জগতের অন্তর্গত। আজকাল সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এই সৃষ্টি সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা চলিয়াছে।

স্কুল সৃষ্টির স্তরে আমাদের শরীরটি আছে। দৈব সৃষ্টির স্তরে আমাদের মন, ভালবাসা বা কল্পনা ও স্বপ্ন এবং নিদ্রা জগৎ অবস্থিত। সৃষ্টির বিজ্ঞান স্তরের খুব কাছাকাছি আমরা স্নায়ুশক্তি কালে অবস্থান করি। কিন্তু সৃষ্টির বিজ্ঞান ও জ্ঞানের স্তরে সমাধি ভিন্ন যাওয়া যায় না। সৃষ্টির শক্তিস্তরে আমাদের আত্মা অবস্থান করেন। এই স্তরে আমাদের সকলের আত্মা একই আত্মা রূপে স্থিত।

স্কুলে সৃষ্টির স্তরকে বিশ্ব বলে, দৈব সৃষ্টির স্তরকে “তৈজস” বলে। বিজ্ঞান সৃষ্টির স্তরকে ‘প্রাজ্ঞ’ বলে। সৃষ্টির শক্তি স্তরকে ‘তুরীয়া’ বলে। এই ‘তুরীয়ার’ নিষ্ক্রিয় অবস্থার নাম ব্রহ্ম। ইতিপূর্বে তর্পণে ব্রহ্ম (শক্তিস্তর), রুদ্র (বিজ্ঞান), বিষ্ণু (হিরণ্য গর্ভ) ,

প্রজাপতি (সমষ্টি মন বা ব্রহ্মা) প্রভৃতি তর্পণের কথা তোমরা নিশ্চয়ই ভুল নাই। সৃষ্টির এসব বিভিন্ন স্তর।

## উপনিষদের জ্ঞান

১। তদেজতি তন্নৈজতি তদূরে তদ্বস্তিকে।

তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্য বাহতঃ ॥ ঈশ ৫ ॥

তিনি চল এবং তিনি অচল, তিনি দূরে তিনি নিকটে। তিনি সব বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত। চল=ক্রিয়াশীল অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম। অচল=নিষ্কল ব্রহ্ম। তিনি দূরে=আমরা যতক্ষণ জ্ঞানহীন আমরা ততক্ষণ দূরে। আমরা জ্ঞানী হইলে তিনি নিকটে হন।

২। যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মনৈবানুপশ্যতি।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ঈশ ৬ ॥

যিনি সর্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্বভূতে দর্শন করেন। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

৩। স পর্যাগাম্ভূক্রমকায়মব্রণমস্লাবিশুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু র্যাথাতথ্যতো হর্থান্ ব্যদধাৎ শাস্ত্রতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥  
ঈশ ৮ ॥

তিনি অশরীর (শরীর লক্ষণ হীন), তিনি নির্মল, তিনি অপাপ বিদ্ধ, জ্ঞানময়, প্রভু, সর্বশ্রেষ্ঠ, স্বয়ম্ভু, সর্বব্যাপী, তাঁহার নিয়মে প্রজাপতিগণ (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মগণ) নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেন।

৪। তং দুর্দর্শং গুঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।

অধ্যাত্ম যোগাধিগামেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহতি। কঠ ৪১ ॥

তিনি দুর্জ্ঞেয়, গুহ্য, সর্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, সকলের বুদ্ধি রূপ গুহ্য অবস্থিত; গহ্বরে (স্বষুম্না গহ্বরে) অধিষ্ঠিত, তিনি সনাতন, অধ্যাত্ম যোগদ্বারা (সমাধি দ্বারা) ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে অবগত হইয়া হর্ষ ও শোক অতিক্রম করেন।

৫। সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি,

তপাসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,

তন্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমেয়ামিত্যতং ॥ কঠ ৪৪ ॥

সমস্ত বেদ যে তত্ত্বকে একমাত্র লক্ষ্য বা পাওয়ার যোগ্য বলিয়া নির্দেশ করেন, সমস্ত প্রকার তপস্যা যাহার জন্য হইয়া থাকে, যাহাকে পাওয়ার জন্য সাধুগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করেন, আমি সংক্ষেপে বলিতেছি ‘ওঁ’ ই সেই পদ।

৬। এতদ্ব্যবাস্করং ব্রহ্ম এতদ্ব্যবাস্করং পরম্।

এতদ্ব্যবাস্করং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ কঠ ৪৫ ॥

এই অক্ষরই ব্রহ্ম স্বরূপ, এই অক্ষরই পরমতত্ত্ব, এই অক্ষরকে জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই সিদ্ধ হয়।

৭। এতদাবলম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদাবলম্বনং পরম্।

এতদাবলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ কঠ ৪৬ ॥

এই ঔঁকারই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এই ঔঁকারই পরম অবলম্বন। এই অবলম্বনকে জানিতে পারিলে ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মতুল্য) পূজ্য হয়।

৮। অশরীরং শরীরেষু অনবশ্বেষ্ব বস্থিতম্।

মহান্তং বিভূমাঙ্গানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ কঠ ৫১ ॥

তিনি শরীরেই আছেন, কিন্তু তাঁহার শরীর নাই। তিনি মহৎ এবং ব্যাপক। ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে জানিয়া দুঃখ অতিক্রম করেন।

৯। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং

অথারসং নিত্যমগন্ধতচ্চ যৎ।

অনাদ্যমস্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং

নিচার্য্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ কঠ ৬৯ ॥

তিনি (যিনি) অশব্দ, আস্পর্শ, অরূপ, অগন্ধ, তিনি নিত্য, তিনি আদি অন্তহীন, তিনি মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ সত্য, তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

১০। অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাঙ্গা

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ। কঠ ৯৫ ॥

এক অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকটী রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছেন ঠিক সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরস্থিত একই আত্মা নানারূপ হইয়া রহিয়াছেন এবং বাহিরেও (অর্থাৎ আকাশে বাতাসে) ব্যাপ্ত আছেন। (আকাশস্থ) বাতাস, জল, বায়ু, বরফ আদি সমস্ত পদার্থেই কিছু না কিছু তাপ আছে। এই তাপই অগ্নি। এই তাপের স্থিতি কিরূপে আমাদের ভিতরে এবং আকাশে ব্যাপ্ত ইহা বুঝিতে পারিলে আত্মারও ব্যাপকত্ব বুঝা যায়। আত্মার ব্যাপকত্ব বুঝিবার জন্য ইহা অত্যন্ত সূন্দর উপমা।

১১। একো বশী সর্বভূতান্তরাঙ্গা

একং রূপং বহুধা যঃ কেরোতি।

তমাঙ্গস্থং যেনানুপশ্যন্তি ধীরা

স্তেষাং স্তথাং শাস্বতং নেতরেষাম্ ॥ কঠ ৯৮ ॥

বশী (সর্বনিয়ন্তা) এক, তিনি সর্বভূতের অন্তর স্থিত আত্মা। তিনি এক হইয়াও বহুরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরমাত্মাকে যে সব ধীর ব্যক্তি নিজের আত্মার মধ্যে দর্শন করেন তাঁহাদেরই শাস্ত্রত স্কথ লাভ হয়, অন্যের নহে।

১২। একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়  
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।  
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতা ধিবাসঃ  
সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ শ্বেতাস্বতর ৬-১১ ॥

তিনি একমাত্র দেবতা, যিনি সর্বভূতের মধ্যে গোপনে অবস্থান করেন। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সকল কর্মের নিয়ামক, সমস্ত সৃষ্টি তাঁহাতে অবস্থিত, তিনি সাক্ষীস্বরূপ, তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তিনি কেবল (সাথীহীন), তিনি নিগুণ।

উপনিষদই হিন্দুধর্মের মূল। এই উপনিষদের বিজ্ঞানবাদ ব্যাখ্যায়ই বৌদ্ধবাদ প্রতিষ্ঠিত। গীতা এই উপনিষদেরই শক্তিবাদ ব্যাখ্যা। আমাদের দেশের বৈষ্ণবচিন্তাতে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার মধ্যে উপনিষদের ভাববাদের পরিকল্পনা বেশ স্পষ্টভাবে স্থান পাইয়াছে। এই উপনিষদ এর আসল সংগ্রহ গীতার যদি শক্তিবাদ টিপ্পনী আমরা করিতে পারি তবে আমাদের জাতীয় জীবনের সব দুর্বলতা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আচার্য্য শঙ্কর উপনিষদের শক্তিবাদ পরিকল্পনাকে অর্থাৎ ‘গীতা’কে ব্রহ্মণ্যবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্করের উপনিষদের টিপ্পনীও ব্রহ্মণ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাববাদী মহাত্মারা উপনিষদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রধান শক্তিবাদ মূলক গ্রন্থটীকে অর্থাৎ গীতাকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ভাববাদ ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের সর্বনাশ করিয়াছেন। গীতা ও উপনিষদের টিপ্পনী লিখিবার পূর্বে বেদের সংহিতা ভাগ পাঠ করা কর্তব্য।

কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান সম্বন্ধে যে তত্ত্ব কথা প্রকাশ করা হইল উহা দ্বারা তোমরা জীবনকে জ্ঞানময় ও কর্মময় করিবার সব রকম বিজ্ঞানই বুঝিতে পারিবে। কিরূপ মহান আমাদের ধর্ম, কিরূপ মহান আমাদের সমাজ, কিরূপ মহান আমাদের ধর্ম প্রবর্তকগণ, কিরূপ মহান আমাদের জন্মভূমির প্রত্যেকটি অণুপরিমাণ!! ভাব এবং মহান ধর্মের অনুসরণ করিয়া জীবনকে ধন্য কর। মহান ধর্মের বিজয় ডঙ্কা পৃথিবীর সর্বত্র বাজাইয়া মূর্খতা, বর্বরতা, ও আঙ্গরিকতার উচ্ছেদ কর। মানুষের জীবনের আনন্দ ফিরাইয়া আন।

## ধর্মগ্রন্থ

যদি কেহ তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ধর্মগ্রন্থ কি? তোমরা অত্যন্ত উচ্চ শিরে জবাব দিবে ‘বেদ’। এই বেদ সম্বন্ধে তোমাদের সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আত্মার আশ্রয়ে ‘জ্ঞান’ সদাকাল বিদ্যমান। এই ‘জ্ঞান’ বেদ। যেমন একখানা কাপড় প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট বুদ্ধিশক্তি বা জ্ঞানের প্রয়োজন, ঠিক সেইরূপ অন্তঃকরণে ও

সমাজজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। সর্বপ্রকার লৌকিক ও অলৌকিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যত প্রকার জ্ঞানের প্রয়োজন 'বেদ' সেই সব জ্ঞানের সমষ্টি। ঋষিগণ আত্মধ্যান দ্বারা এবং গবেষণা দ্বারা সমস্ত প্রকার জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইহারই নাম তপস্যা। তাঁহাদের সেই সব জ্ঞানরাশি মস্তকের আকারে বেদ রূপে বিদ্যমান। যাঁহারা এই চিরসত্য জ্ঞানকে জানেন তাঁহাদিগকে ঋষি বলা হয়। বেদ সবই মস্তক আকারে সংগৃহীত। এই পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র আমরাই বেদের অধিকারী বলিয়া গর্বিত। এবং আমরাই মাত্র উন্নত শিরে বলিতে পারি ঋষি আমাদের আদি পিতা। বেদের সব শাখা এখন পাওয়া যায় না। যতটা পাওয়া যায় উহার সংগ্রহও প্রকাণ্ড গ্রন্থ।

বেদ, অনুভূতি ও জ্ঞান একই কথা। বেদের অন্য নাম 'শ্রুতি'। একযুগে ঋষিগণ এই সত্য তপস্যা দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এজন্য ইহার নাম বেদ। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে গুরু বা আচার্য্যের নিকট এই জ্ঞান শ্রবণ করিয়া আয়ত্ত করা হইত বলিয়া বেদের অন্য নাম "শ্রুতি"।

বেদের চার ভাগ আছে। যথা - ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব্ব। গান, পদ্য ও গদ্য, তিন প্রকারে মন্ত্রগুলি পাওয়া যায়। এই জন্য বেদের এক নাম 'ত্রয়ী'।

বেদকে ভিত্তি করিয়া শাস্ত্র (শাসন বিজ্ঞান) প্রস্তুত হইলে উহার নাম হয় 'স্মৃতি'। দর্শন শাস্ত্রগুলি এবং সমাজ ব্যবস্থামূলক গ্রন্থগুলি সবই স্মৃতি নামে খ্যাত।

প্রত্যেক বেদের তিনটি ভাগ আছে। যথা - সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ। স্তুতিপ্রধান মন্ত্র রাশিই সংহিতা। সংহিতায় স্তুতি কথার মধ্যে সব রকম জ্ঞান নিহিত আছে। আমাদের সব প্রকার কর্তব্য এই সব মন্ত্রে পাওয়া যায়। 'ব্রাহ্মণ' ভাগে যজ্ঞাদির বিধান ও সংহিতা ভাগের ব্যাখ্যা আছে। 'উপনিষদ' ভাগে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক আশ্চর্য্য অনুভূতিগুলির সংগ্রহ আছে। সংহিতা ভাগেও কিছু কিছু উপনিষদ পাওয়া যায়। আবার ব্রাহ্মণ ভাগেও উপনিষদ কিছু কিছু বিদ্যমান। অনেকে বলিতে চান যে উপনিষদ সংহিতা ভাগ হইতে কিছুটা আধুনিক। আমরা ইহা স্বীকার করি না। কারণ সংহিতা ভাগেও উপনিষদ রহিয়াছে। ইহা সত্যকথা যে বর্ত্তমান সময় যে সব উপনিষদ পাওয়া যায় উহাদের অনেকগুলি উপনিষদ আধুনিক। এইসব উপনিষদের সত্য ও সংহিতা ভাগে প্রাপ্য উপনিষদের সত্য একই রূপ; কাজেই উপনিষদ ও সংহিতা একই যুগের জ্ঞান। নানাপ্রকার উপধর্ম্ম ও শাখা ধর্ম্মকে বেদের শাখা দেখাইয়া পৌরোহিত্যবাদটী কয়েক রাথিবার জন্যও অনেক উপনিষদ রচিত। সংহিতার মত ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের অনেক শাখাই অপ্রাপ্য।

বেদকে বুঝিবার জন্য ষড়ঙ্গ বেদ পড়িতে হয়। ইহাদের নাম, যথা-

১। **শিক্ষা**। অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থকে শিক্ষা গ্রন্থ বলে। যাজ্ঞ বস্ক্য, পাণিনি, কাত্যায়নী প্রভৃতি মহর্ষিগণের শিক্ষা গ্রন্থ আছে।

২। **নিরুক্ত**। বৈদিক শব্দ সমূহের পরিভাষার নাম বৈদিক কোষ। মহর্ষি যাক্ষের কোষ পাওয়া যায়। ইহাই পৃথিবীর প্রথম অভিধান।

৩। **কল্প**। যজ্ঞাদির ব্যবস্থা, ঔষধাদির বিধান। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের কল্প আছে।

৪। **ছন্দ**। বৈদিক মন্ত্র সমূহের উচ্চারণ বিজ্ঞান। ইহা অনেকটা পদ্য বিষয়ক।

৫। **ব্যাকরণ**। বৈদিক ভাষার বিজ্ঞান। মহর্ষি পাণিনির ব্যাকরণ আছে।

৬। **জ্যোতিষ**। গ্রহ, লক্ষণ, পৃথিবী ও রাশিদের গতি স্থিতি সম্বন্ধীয় নিখুঁত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। বেদকে ভিত্তি করিয়া যাহাতে কেহ ভাববাদিতার প্রশয় না দেয় এই জন্য এই সব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া বেদ পড়িবার নিয়ম। অনেক মূর্খ বেদের অঙ্গ জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া পৃথিবীর ও গ্রহ নক্ষত্রের স্থিতি ও অবস্থান সম্বন্ধে পুরাণ কল্পিত রূপকথাকে আর্য্য জ্ঞান বলিয়া প্রচার করিয়াছে। তাঁহারা পৃথিবীকে কচ্ছপের উপর স্থাপনা এবং রাহু দ্বারা চন্দ্র সূর্যকে গ্রাস ইত্যাদি পুরাণ-কথাকে ভিত্তি করিয়া পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র গ্রহাদির গতির আবিষ্কার আধুনিক পণ্ডিতগণ করিয়াছেন বলিয়া বলিতে চান। তোমরা জ্যোতিষ পড়িলে দেখিতে পাইবে সেই অতীত বৈদিক যুগেই পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষগণ পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন। জ্যোতিষ উহারই অপ্রাস্ত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

**উপবেদ**। বেদজ্ঞানের বিশেষ সম্বন্ধীয় বেদ আছে। উহাদিগকে উপবেদ বলে। অনেক উপবেদ আছে। তাহার চারখানা প্রধান। যথা -

সামবেদের উপবেদ - গান্ধর্ববেদ ( সঙ্গীত বিষয়ক )।

যজুর্বেদের উপবেদ - ধনুর্বেদ ( অস্ত্রশস্ত্র ও রণবিদ্যা বিষয়ক )।

ঋগ্বেদের উপবেদ - আয়ুর্বেদ ( শরীর তত্ত্ব ও চিকিৎসা বিষয়ক )।

অথর্ব বেদের উপবেদ - অর্থবেদ (রাজনীতি, কূটনীতি, সর্বপ্রকার জড়বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ধনবিজ্ঞান বিষয়ক)।

**স্মৃতি**। মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্খ প্রভৃতি মহর্ষিদের স্মৃতি আছে। দর্শনশাস্ত্রগুলিও স্মৃতি নামে খ্যাত।

**পুরাণ**। ১৮ খানা পুরাণ শ্রেষ্ঠ। যথা ব্রাহ্ম, পাদ্য, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আঙ্গৈয়, ভবিষ্য, ব্রহ্ম, বৈবর্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কোর্ম, মাৎস্য, গাড়ুর, ব্রহ্মাণ্ড। ইহা ভিন্নও অন্যান্য উপপুরাণ আছে। পুরাণগুলিতে অনেক বৈদিক তত্ত্বের মীমাংসা আছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, যোগ, তন্ত্র শাস্ত্রাদিরও অনেক মীমাংসা আছে। অনেক কথার অর্থও বুঝা যায় না। অনেক পুরাণে যথেষ্ট প্রক্ষিপ্ত কথাও আছে। কোন কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পুরাণকে উপবেদ বলা হইয়াছে। পুরাণকে মন্বন্তরের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ জানিবে। সমস্ত পৃথিবীতে যে একযুগে হিন্দু ধর্ম প্রচলিত ছিল, পুরাণে উহার আভাস পাওয়া যায়।

**রামায়ণ ও মহাভারত**। ইহারা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। কিছু কিছু কাব্যভাবও আছে। পুরাণের অনেক কথা ইহাতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের প্রাচীন সভ্যতার সব কথাই রামায়ণ ও মূল মহাভারতে বিদ্যমান। তোমরা মূল রামায়ণ ও মূল মহাভারত পাঠ করিবে বা উহাদের ব্যাখ্যা পড়িবে। মহাভারত আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও কথাগুলি অতীব স্কন্দর ও যুক্তিপূর্ণ। এদিকে ভাগবতের পাঠ সমাজে বেশ বৃদ্ধি হইয়াছে। তোমরা মহাভারতের আলোচনা বৃদ্ধি করিবে।

**তন্ত্রশাস্ত্র**। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান প্রবর্তক মহর্ষি কপিল। কপিল বঙ্গদেশে সাগর সঙ্গমে অবস্থান করিতেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তিন প্রকারের চিন্তাধারা দেখিতে পাওয়া যায়। উহার একটা ধারাতে অত্যন্ত উচ্চস্তরের দার্শনিকতা ও যোগবিদ্যার কথা আছে। সৃষ্টির শক্তিস্তরের সমস্তপ্রকার যোগবিদ্যা একমাত্র তন্ত্রেই আছে। তন্ত্রের একটা দিক আছে যাহাতে মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন ও রোগাদির শান্তি করণের বিধান আছে। অনেকে তন্ত্রের এই অংশকেই তন্ত্র বলিয়া জানে। তন্ত্রের আরও একটা দিক আছে, উহা শিবস্তরের যোগবিদ্যায় পরিপূর্ণ। সব তন্ত্রই আনুষ্ঠানিক বিদ্যার অন্তর্গত। গুরু ভিন্ন ইহাতে প্রবেশ অসম্ভব। কোন কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে (বেদ) তন্ত্রকে উপবেদ বলা হইয়াছে। বেদ যেমন লৌকিক ও অলৌকিক জীবনের সব দিকের সব তথ্যপূর্ণ বিরাট গ্রন্থ তন্ত্রও তেমনি লৌকিক ও অলৌকিক সব রকম জীবনের জন্য বিরাট চিন্তারাশি। সমাজ, রাজনীতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, শরীরতত্ত্ব, রসায়ন, সঙ্গীত; যদিকে তাকাও দেখিতে পাইবে তন্ত্র বেদের জ্ঞানকে সমুল্লত শিখরে স্থান দিতেছে। অনেক স্থানের চিন্তা এতই গভীর, মনে হয়, বেদের মতই ইহা একটি মৌলিক চিন্তাধারা এবং বেদের মতই ইহার চিন্তা প্রাচীন; যদিও ইহার ভাষা বেদ হইতে আধুনিক। ইতিপূর্বে শিবমূর্তির কথা বলিয়াছি। এই মূর্তি তন্ত্রের দান। সব রকম মূর্তিই তন্ত্রের দান। তোমরা যদি “মহানির্বাণ” তন্ত্র পাঠ কর তবে তন্ত্রের মোটামুটি সব জ্ঞান লাভ হইবে। খুব ছোট তন্ত্রের মধ্যে জ্ঞান সংকলিনী তন্ত্র ভাল বই। বঙ্গদেশীয় পূজা বিধানে তান্ত্রিক যোগবিদ্যা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ, তীব্বত, চীন, আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি দেশে তন্ত্রের প্রচলন খুব বেশী। ইহাদের বঙ্গ, নেপাল ও মহারাষ্ট্র তন্ত্রবিদ্যার জন্য খুব প্রসিদ্ধ। একযুগে সমস্ত এশিয়া খণ্ডে ও আফ্রিকায় তান্ত্রিক জ্ঞান প্রচলিত হয়।

**যোগশাস্ত্র**। ইহা তন্ত্রবিদ্যারই শাখা। শক্তিস্তরের যোগবিদ্যা তন্ত্র ভিন্ন কোথাও নাই। শিবস্তরের যোগবিদ্যা যোগশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে। ইহাকে ‘অষ্টাঙ্গ যোগ’ বলে। হিন্দুধর্মের দার্শনিক জ্ঞানের আনুষ্ঠানিক ভাগের নাম যোগশাস্ত্র। যোগবিদ্যার আসল লক্ষ্য মনকে ক্রমশঃ উচ্চতর স্তরে বিকশিত করিতে সাহায্য করা। যোগদর্শন আলোচনা করিলে মনের নিম্ন ও উচ্চতর স্থিতির সব কথাই জানা যায়। শিব সংহিতা, অষ্টবক্র সংহিতা যোগ সম্বন্ধে ছোটের মধ্যে ভাল বই।

**রুদ্রী**। সংহিতা (বেদ) ভাগের সার কথায় পরিপূর্ণ। ইহাতে বেদজ্ঞানের সব কথাই ছোট আকারে বিদ্যমান। এই রুদ্রী পাঠ করিয়া বিশ্বনাথের আরতি হইয়া থাকে। ইহাতে মাত্র আটটি ছোট ছোট অধ্যায় আছে। বেদের কর্মধর্ম, উপাসনধর্ম ও জ্ঞানধর্মের সারভাগ রুদ্রীতে বিদ্যমান। ইহার একটি অধ্যায় অঙ্গুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিষয়ক। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়টি পুরুষসূক্ত। স্ত্রীবিধা হইলে ইহা তোমরা আয়ত্ত করিবে, ইহা বিশ্বরূপ স্তুতি।

**গীতা**। দ্বাপর যুগের বিপ্লব গ্রন্থ মহাভারতের অংশ। ইহাতে বেদের কর্ম বিজ্ঞান, উপাসনা বিজ্ঞান ও জ্ঞান ধর্মের (উপনিষদের) সব কথাই বিদ্যমান। অঙ্গুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেই হইবে। এই নীতিকে ভিত্তি করিয়া যে দার্শনিকতা, যোগ ও মনোবিজ্ঞান হিন্দু ধর্মের ভিত্তি উহার আলোচনা ইহাতে হইয়াছে। উহা বুঝিতে হইলে তোমাদিগকে এখনই ধর্মানুশীলনে মন দিতে হইবে। যত বয়স বৃদ্ধি হইবে ততই নূতন নূতন

চমৎকারিতা গীতায় দেখিতে পাইবে। ইহা দর্শনশাস্ত্রের সার। গীতার শক্তিবাদী ব্যাখ্যা না থাকায় আমাদের সমাজের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে।

**চণ্ডী।** ইহা সত্য যুগের সমাজ বিপ্লবের কাহিনী। এই সমাজ বিপ্লবের কাহিনী ও মনোবিকাশের স্তরগুলি একই বিজ্ঞানে স্থান পাইবার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছে। আত্মাকে বা মহাশক্তিকে মা বলিয়া উপাসনা করিবার রহস্য এবং সমাজ জীবনের একই মহাশক্তিকে ‘মা’ বলিয়া মানিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবার বিজ্ঞান ও শক্তিশালী হইবার কথা ইহাতে সুন্দর সামঞ্জস্য হইয়াছে। চণ্ডী সমস্ত তত্ত্ব বিদ্যার সার। আঙ্গুরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ ব্যাপারে রুদ্রী, গীতা ও চণ্ডী একই নীতির সমর্থক। গায়ত্রী উপাসনা এই চণ্ডীরই উপাসনা জানিবে। চণ্ডী ভক্তিবাদ প্রধান ‘শক্তিবাদ’ গ্রন্থ। ইহা রাজনীতি, সমাজনীতি ও দার্শনিক বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। বেদ ভিন্ন অন্য যত সব ধর্ম গ্রন্থের কথা বলা হইল ইহা বেদের শাখা জানিবে। চণ্ডীর মধ্যে দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ শক্তির ৪টি স্ততি আছে। উহার মধ্যে একটি বা দুটি তোমরা আয়ত্ত করিয়া রাখিবে।

## স্বাস্থ্য ধর্ম

স্বাস্থ্যধর্ম আমাদের ধর্মজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভিত্তি। ইহাকে কর্ম ধর্মের অন্তর্গত জানিবে। মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে প্রাণকেন্দ্র আছে। বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম দ্বারা এই প্রাণকেন্দ্র সতেজ থাকে। ইতিপূর্বে তোমাদিগকে মস্তিষ্কের আরও সব কেন্দ্রগুলির কথা বলিয়াছি। সংক্ষেপে সেইগুলির পরিচয় চিত্রে দেখ এবং কেন্দ্রগুলি চিনিয়া লও। ১ = প্রাণকেন্দ্র। ১ = কর্মকেন্দ্র। বা ব্রহ্মা। বা মন। ২ = সূর্য্য কেন্দ্র। ইহাই স্মৃতির কেন্দ্র। স্বপ্নস্তর। ৩ = বিষ্ণুকেন্দ্র। ইহার অন্য নাম স্তম্বকেন্দ্র, নিদ্রাস্তর। ইহাও স্মৃতির কেন্দ্র। সূর্য্য ও বিষ্ণুস্তরের স্মৃতি একরকম নহে (ক্রম বিকাশ দ্রষ্টব্য) ৪। শিবকেন্দ্র ইহাই ধর্মকেন্দ্র। স্মৃষ্টি স্তর। ৫ = জ্ঞানকেন্দ্র। ৬ = অব্যক্ত কেন্দ্র। কর্তৃত্বকেন্দ্র। ৭ = গণেশকেন্দ্র বা বিবেক, বিচার কেন্দ্র। ১০ = ইহা একটি রেখা। ইহার নাম শক্তিরেখা। তোমরা যদি একটু চিন্তা করিয়া পর্য্যালোচনা কর তবে বুঝিতে পারিবে, সবগুলি কেন্দ্রের ঠিক সতেজ অবস্থা আয়ত্ত করিতে পারিলে আমাদের জীবন সুখময় ও আনন্দময় হয়। ইহাদের মধ্যে ঐ প্রাণকেন্দ্রটি সতেজ রাখিবার বিজ্ঞানমাত্রই এই স্বাস্থ্যধর্ম অংশে বলা হইবে। আমাদের যোগশাস্ত্রে হঠযোগ নামক যোগাঙ্গের সবই স্বাস্থ্যধর্ম মূলক।

সব জাতিরই চিন্তা ও বিজ্ঞানধারার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের সব রকম চিন্তার দৃষ্টিভঙ্গী পৃথিবীর সব দেশ এবং জাতির চিন্তাধারা অপেক্ষা একটু অন্য রকমের। আমরা মেরুদণ্ড ও উহার মধ্যস্থিত নাড়ীমণ্ডলীকে কেন্দ্র করিয়া শরীর, মন, বিবেক, প্রেম, স্তম্ব, শান্তি, ধর্ম ও জ্ঞানচর্চা করিয়া থাকি। অন্যান্য দেশ মানবজীবনের এই সত্য সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ। আমাদের জীবনসত্যের সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার মধ্য যুগের অপকল্পজ্ঞানীদের অদূরদর্শিতায় আমাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেছে, যাহার জন্য আমরা আজ পরাধীন। আমাদের আবার সেই শক্তিতে, আমাদের ঠিক ঠিক

দৃষ্টভঙ্গীকে উদ্ধার করিতে হইবে। অন্যান্য দেশের ব্যায়াম পেশীগুলিকে শক্ত করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশের ব্যায়াম ঋষিগণ কর্তৃক প্রবর্তিত হইবার দরুণ সেই ব্যায়াম ধারা জীবনীশক্তির মূল আধার মেরুদণ্ডকে কার্যক্ষম রাখিবার দিকে নজর রাখিয়া করা হয়। এইরূপ উভয় প্রকার ধারায় ব্যায়াম করিবার ফলও দুই প্রকারের হয়। যাহারা মেরুদণ্ডের সম্বন্ধহীন ব্যায়াম করে তাহারা জীবনের এক সময় বাতগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। আমরা এখানে যেক'টী ব্যায়ামের কথা বলিব সেইগুলি বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলের জন্য সমান ভাবে উপযোগী। কাজেই সকলকে এই ব্যায়াম অভ্যাস করিতে উৎসাহ দান করিবে এবং নিজেরাও করিবে।

প্রত্যেক গ্রামে এবং প্রত্যেক পল্লীতে বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণ সকলে একটা পবিত্রস্থানে সূর্যাস্তকালে একত্রিত হইবে এবং সমবেত ভাবে ব্যায়াম অনুষ্ঠান করিয়া বাড়ীতে ফিরিবে। বর্তমান সময় এদেশে পশ্চিমী খেলা ও ব্যায়াম প্রবর্তিত হইয়াছে। উহার উভয়টিই আমাদের মত গরীব জাতির জন্য অনুপযুক্ত। ঐসব খেলার জন্য বহু অর্থ ও বিরাট মাঠের প্রয়োজন হয় এবং উহাতে মাত্র ২২ জন লোক খেলা করিতে পারে। ঐসব খেলা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। তোমরা কোন মন্দিরের প্রাঙ্গণে বা কোন পবিত্র খোলা স্থানে ব্যায়ামের জন্য সমবেত হইবে। বালিকা ও নারীগণ বাড়ীর মধ্যে একত্রিত ভাবে বা স্বতন্ত্র ভাবেই ব্যায়াম সম্পন্ন করিবে। নর নারীরা একস্থানে ব্যায়াম করিবে না। (যাহারা পেশীর জন্য অতিরিক্ত ব্যায়াম করিতে চায় তাহারা উহাও করিতে পারিবে)।

যাহারা পেট ভরিয়া নুন ভাত এবং নুন রুটী আহার করিতে পারে তাহারাও এই ব্যায়াম দ্বারা উপকৃত হইবে। আমরা এমন কয়েকটী বাছা বাছা সরল ব্যায়াম এখানে প্রবর্তন করিলাম যাহা গরীব, ধনী, শিশু, বৃদ্ধ ও নর নারীর জন্য সমান ভাবে উপকারী।

সমবেতভাবে ব্যায়াম করিবার জন্য কতগুলি নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস করিতে হয়। এজন্য কতকগুলি আদেশ লেখা হইল। ঐ গুলি একজন নির্দেশকের অধীন হইয়া আয়ত্ত করিবে এবং নির্দেশকের অধীন হইয়া অনুষ্ঠান করিবে। প্রথম আমরা আদেশগুলির কথা বলিতেছি।

১। আরামে। Stand at ease. দুই পা ফাঁক (৩০") করিয়া দাঁড়াও। হাত পেছনে বাঁধা থাকিবে। এই আদেশ দিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। এই আদেশ শুনিবা মাত্র যে যেখানে আছে সেইখানেই ঐ ভাবে দাঁড়াইবে এবং বাম পায়ে ভর দিবে।

২। সম্যক্। (form single ring) । একের পেছনে অন্যে দাঁড়াইবে। দাঁড়াইবার সময় দুই হাতের বেশী স্থান মাঝখানে থাকা চাই।

৩। পুরস্ যোজয়। আগের সঙ্গে মিল। অর্থাৎ যদি দুইজনের মধ্যে দুই হাতের বেশী স্থান থাকে সেটা কম করিয়া নির্দিষ্ট দুই হাত ফাঁক মাত্র রাখিয়া দাঁড়াইবে। এবং ডানে বামে তাকাইয়া লাইন সোজা করিয়া দাঁড়াইবে।

৪। স্বস্থয়। স্বেদে দাঁড়াও। বাম পা যথাস্থানে ফাঁক করিয়া রাখিবে। এই আদেশে এদিক ওদিক তাকানো যায় এবং হাত নাড়া যায়। কথাও বলা যায়।

৫। দক্ষয়। (alert) সোজা হইয়া দাঁড়াও, দুই পা একত্র কর, নজর শত গজ সম্মুখে রাখ, দুই হাত উরু স্থানে রাখ, অঙ্গুলিগুলি পরস্পর লাগিয়া থাকিবে।

৬। সিদ্ধয়! প্রস্তুত হও। ইহা 'দক্ষয়' এর সমকক্ষ। দক্ষয় অবস্থায় থাকিয়া বাম পদে ভর দিবে।

৭। সাবধান। আদেশের জন্য প্রস্তুত হও। যদি উন্মনস্ক দেখা যায় তবে এই আদেশ দিবে। এই আদেশ পাইলে বাম পদে ভর দিবে এবং সম্মুখের দিকে সতেজ হইয়া তাকাইবে।

৮। প্রচল। আগে চল। forward.

৯। বেগ চল। দৌড়াও।

১০। দক্ষিণ। ডান পা ফেল।

১১। বাম। বাম পদ ফেল।

১২। এক পদ প্রস্‌সর। এক পা অগ্রবর্তী হও। (আগে বাম পা ফেলিও, যুদ্ধপন্থা আমাদের ধর্ম্য মতে বাম মার্গী পন্থা)।

১৩। দ্বিপদ প্রস্‌সর। দুই পা অগ্রবর্তী হও।

১৪। ত্রিপদ প্রস্‌সর। তিন পা অগ্রবর্তী হও।

১৫। চতুর পদ প্রস্‌সর। চার পা অগ্রবর্তী হও।

১৬। উপবেশয়। বস।

১৭। উত্তিষ্ঠয়। দাঁড়াও।

১৮। মণ্ডলয়। গোলাকারে দাঁড়াও। ঘেরিয়া ফেল।

১৯। গণ বিভাগ। এক দুই, এক দুই, বল। number in twos. লাইনের বাম দিকে প্রথম ব্যক্তি দুই বলিবে। এই ভাবে গণিয়া চলিবে।

২০। দ্বিতী। দুই ভাগ হইয়া যাও। এক নম্বর দুই পা আগে আসিবে।

২১। অংশ ভাগ। এক, দুই, তিন; এক দুই তিন বল। number in threes.

২২। ত্রিতী। তিন ভাগ হইয়া যাও। ১নং চার পা আগে, ২নং স্বস্থানে, এবং তিন নম্বর দুই পা পেছনে।

২৩। গণ ভাগ। এক, দুই, তিন, চার; এক দুই তিন চার বল; number in fours.

২৪। চতুরতী। চার ভাগ হইয়া যাও। ১নং চার পা আগে, ২নং স্বস্থানে, ৩নং দুই পা আগে এবং ৪নং দুই পা পেছনে।

২৫। বাম দৃগ্। eyes left. বাম দিকে তাকাইয়া লাইন সোজা কর।

২৬। দক্ষিণ দৃগ্। eyes right. ডান দিকে তাকাইয়া লাইন সোজা কর।

২৭। স্তব্ধয়। থাম।

২৮। ভঙ্গছত্রং। ছিঁরাইয়া যাও।

২৯। সমক্ষম্। সামনা সামনি দাঁড়াও। এই আদেশ দুইটা সারিতে দণ্ডায়মানগণকে মুখামুখী করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে।

৩০। বিপরীতম্। বিপরীত মুখী দাঁড়াও। এই আদেশ দুইটা সারিতে দণ্ডায়মানগণকে পরস্পরের বিপরীত মুখী করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে।

৩১। অগ্রানুত্তিষ্ঠ। আগের লাইনের সঙ্গে সমানে দাঁড়াও। দ্বিতী প্রভৃতি বিভাগ হইবার পর লাইনের ধার সোজা করিবার জন্য এই আদেশ প্রয়োজন হয়।

সমবেত ভাবে অধ্যাত্ম ধর্ম অনুষ্ঠান করিবার জন্য আরও কয়েকটি আদেশ প্রয়োজন হইবে। যথা -

৩২। অধ্যাত্ম ধর্মানুষ্ঠানে সিদ্ধয়। এই আদেশ পাইলে ব্রহ্মনাড়ীতে মন দিবে।

৩৩। স্বস্তিকাসনে উপবেশয়। বসিবার আসন না থাকিলে এই আদেশ দিবে না। (বা পদ্মাসনে উপবেশয়)। বসিবার আসনের ব্যবস্থা না থাকিলে দাঁড়াইয়া উপাসনা করিবে।

৩৪। (ক) পূর্বাভিমুখং ভব ॥ (খ) উত্তরাভিমুখং ভব ॥ (গ) ঈশানাভিমুখং ভব ॥ পূর্ব। উত্তর। ঈশানাভিমুখ হও।

৩৫। মূলাধারে কুণ্ডলিনী নামক মহাশক্তিং ধ্যায়েৎ ॥

৩৬। সহস্রারে (শিবপিণ্ডে) পরম ব্রহ্মন্ ধ্যায়েৎ ॥

৩৭। মূলাধারাৎ সহস্রার পর্যন্তব্যাপ্তং ব্রহ্মনাড়ীং ধ্যাওয়া ত্রিধা গায়ত্রীং তথা ব্রহ্ম স্তোত্রং গায়েৎ।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (১)\*** - দক্ষয় ॥ ১ - পায়ের অঙ্গুষ্ঠ একত্র কর। হাত সামনের দিকে দিয়া মাথার উপর তোল। বাহুমূল কর্ণ সংযুক্ত থাকিবে। এইভাবে তিন সেকেণ্ড থাক।

২ - সামনের দিকে ঝুকিয়া হাতের অঙ্গুলী পায়ের অঙ্গুলীর সঙ্গে লাগাও। দৃষ্টি হাটুর দিকে রাখ। এইভাবে তিন সেকেণ্ড থাক। (১-২ আদেশ ৬টি হইতে ৮টি দিতে পারিবে)।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (২)** - দক্ষয় ॥ ১ - পায়ের অঙ্গুষ্ঠ মিলাও। হাত দুইটা কাঁধের সোজা উপরে দুই পার্শ্ব তোল। হাতের অঙ্গুলি সব খোলা ও সোজা থাকিবে। এই ভাবে ৩ হইতে ৫ সেকেণ্ড অবস্থান কর।

২ - হাত দুইটা ধীরে ধীরে সামনের দিকে আন ও সোজা আনিয়া কর দুইটা মেলাও। এইরূপ ১-২ আদেশ ৬টি দিবে। ১২টির বেশী দিবার প্রয়োজন হইবে না।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (৩)** - দক্ষয় ॥ ১ - হাত দুইটা দুই পাশ দিয়া মাথার উপরে তোল, দুই হাতের তলা মিলাও। হাত দুইটা ঠিক কাণের সোজা উপরের দিকে তুলিবে।

২ - ঐ ভাবে বাম পার্শ্ব মোড়। যেন পা উঠে না।

১ - এবার এক স্থিতিতে এস।

৩ - ঐ ভাবে দক্ষিণ পার্শ্ব মোড়। আদেশ - ১-২, ১-৩। এইরূপ আদেশ ৬টি দিবে। ১২টির বেশী দিবে না।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (৪)\*** - দক্ষয় ॥ ১ - দুই পা লম্ফ দ্বারা ফাঁক কর, সেই সঙ্গে হাত দুইটা কাঁধের সোজা উপরে তোল।

২ - পা দুইটা লম্ফ দ্বারা একত্র কর এবং হাত দুইটা উরুতে মিলাও অর্থাৎ দক্ষয় স্থিতিতে এস। (১-২ আদেশ ২৫ হইতে ৪০ দিবে)।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (৫)\*** - বুকডন। বুক ডন করিবার জন্য প্রস্তুত হও। অর্থাৎ দুই হাতের পাতায় ও দুই পায়ে ভর দিয়া সোজা মাটির উপর অবস্থান কর।

- ২ - বাম পা পেটের দিকে মোড়, যেন মাটীতে না লাগে।  
 ৩ - ডন দাও। অর্থাৎ বুক নামাও।  
 ৪ - উঠ-। উঠবার সময় বুকের দিক আগে উঠাইবে এবং কোমরের দিক পরে উঠাইবে।  
 ১ - স্থিতিতে এসো।  
 ২ - এবার ডান পা মুড়িবে।  
 ৩ - ডন দাও অর্থাৎ বুক নামাও।  
 ৪ - উঠ-। পূর্ববৎ ॥ আদেশ (১,২,৩,৪,) ৬টা হইতে ৮টা দিবে।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (৬) - দক্ষয় ॥** ১ - বাহুর পেশী কষিয়া হাতের মুষ্টি বাঁধ। মুষ্টি দুইটি বুকের দুই পার্শ্ব থাকিবে। বাম পায়ে দাঁড়াও ॥ ২০ পা এক পায়ে চলিবার পর পরিবর্তয় অর্থাৎ ফিরিবে। এবার ২ - আদেশ দিলে ডান পায়ে দাঁড়াইয়া ২০ পা চলিবে। এইভাবে ১-২ আদেশ ৪ হইতে ৮টি দিতে পারিবে। এই ব্যায়ামে লক্ষ্যকালে সব সময় পায়ের সামনের দিকে ভর দিবে। গোড়ালীর দিকে ভর দিয়া লক্ষ্য দিলে আঁতে বা জরায়ুতে চোট লাগিতে পারে। বিশেষ করে মেয়েরা এই ব্যায়াম কালে খেয়াল রাখিবে যেন পায়ের সামনের দিকেই ভর পড়ে।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (৭) -** পা মেলিয়া বস। ১ - মেরুদণ্ড সোজা কর। হাত দুইটা সামনের দিক দিয়া মাথার উপর তোল। অঙ্গুষ্ঠ দুইটি মিলাও। এভাবে তিন সেকেণ্ড থাক। ২ - মাথাসহ হাত ও বুক নামাইয়া হাতের অঙ্গুলী দ্বারা পায়ের অঙ্গুলী ধর। তিন সেকেণ্ড থাক। এই আদেশ ১-২, ৬টি হইতে ৮টি দিতে পারিবে।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (৮) -** (৭) নং অনুষ্ঠান বিধিতে পা মেলিয়া বস।  
 (১)-(৭) নং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের '১' আদেশের নিয়মে হাত উপরে তুলিয়া অঙ্গুষ্ঠ বাঁধ এবং মেরুদণ্ড সোজা কর। এই ভাবে তিন সেকেণ্ড থাক।  
 ২ - ঐ ভাবে বাম দিকে মোড় ও তিন সেকেণ্ড থাক। ১ - আবার স্থিতিতে এস। তিন সেকেণ্ড থাক। ৩ - এবার ডান দিকে মোড়। তিন সেকেণ্ড থাক। আদেশ ১-২, ১-৩। ৬টি আদেশ দিতে পারিবে। ১২টির বেশী দিবে না।

এবার কয়েকটি স্বাস্থ্যধর্মবিধি শয়ন অবস্থায় অনুষ্ঠান করিবার নিয়ম বলা যাইতেছে। এসব বিধান সমবেত ভাবে করিবার প্রয়োজন নাই। এইগুলি করিতে হইলে বিছানা বা চোঁকি অথবা পাকা মেঝের ব্যাবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই সব শয়ন ব্যায়ামগুলি অত্যন্ত উপকারী এবং নর ও নারীদের জন্য অত্যন্ত হিতকারী। শয়ন অবস্থায় ব্যায়াম করিবার স্লবিধা না থাকিলে ১-৭ নং ব্যায়াম করিয়া ব্যায়াম শেষ করিবে এবং উপাসনার আদেশ দিবে।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (৯)** – পাটীমোড়া ব্যায়াম।

খুব টান টান হইয়া চিৎ শয়ন কর। গোড়ালী দুইটি সংলগ্ন কর। হাত দুইটি কানের সোজায় মাথার উপর সংলগ্ন কর।

১ – এবার বামদিকে মোড়। সবটা শরীরের বোঝা বামপার্শ্বে চলিয়া আসিবে। বরং আরও একটু বেশী সামনের দিকে কাৎ হইবে।

২ – ঐরূপে ডান দিকে মোড়।

আদেশ :- ১-২। ১০টি হইতে পনরটী আদেশ দেওয়া যাইবে।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (১০)** – (৯) নং বিধানে টান টান হইয়া শয়ন কর। হাত দুইটি মুড়িয়া মাথার নিম্নে স্থাপন কর। এবং বাহুদ্বয় দ্বারা কপালের দুইদিক একটু চাপিয়া ধর। ১ – বামদিকে মোড়। ২ – ডান দিকে মোড়। এইরূপ আদেশ ১০-১৫টি দিতে পারিবে।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (১১)** – ৯নং বিধানে টান টান হইয়া শয়ন কর। হাত দুইটি সোজা দুই উরুতে রাখ। ১ – বাম দিকে মোড়। ২ – ডান দিকে মোড়। এইরূপ আদেশ ১০ হইতে ১৫টি দিতে পারিবে।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (১২)** – ৯নং বিধানে টান টান ভাবে উপুড় হইয়া শয়ন কর। হাত দুইটী মাথার উপর সোজা উঠাইয়া সংলগ্ন কর।

১ – বামদিকে মোড়। ২ – ডান দিকে মোড়। এইরূপ আদেশ ১০ থেকে ১৫টি দিতে পারিবে।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (১৩)** – ১২নং বিধানে উপুড় হইয়া শয়ন কর। হাত দুইটী সোজা করিয়া উরুতে সংলগ্ন কর। ১ – বাম দিকে মোড়। ২ – ডান দিকে মোড়। এইরূপ আদেশ ১০ হইতে ১৫টি দিতে পারিবে। নারীরা শাখা বা কাঁচের চুড়ি পরিয়া এই সব শোয়া ব্যায়াম করিলে চুড়ি ভাঙ্গিয়া যাইবে।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (১৪)\*** – ১৩নং বিধানে উপুড় হইয়া শয়ন কর। হাত দুইটি পিঠের উপর রাখিয়া ডান হাতে বাম কবজী ধর। ১ – বাম দিকে মোড়। ২ – ডান দিকে মোড়। এইরূপ আদেশ ১০ হইতে ১৫টি দিতে পারিবে।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (১৫)\*** – ১৩নং বিধানে উপুড় হইয়া শয়ন কর। পা দুইটি মুড়িয়া পিঠের দিকে আন। পদদ্বয় হস্তদ্বয় দ্বারা ধর।

১ – বাম দিকে মোড়। ২ – ডান দিকে মোড়। এইরূপ আদেশ ১০ হইতে ১৫টি দিতে পারিবে।

**স্বাস্থ্য ধর্ম (১৬)\*** – শামুক ব্যায়াম। চিৎ হইয়া শয়ন কর। হাত দুইটি মুড়িয়া বুকের দিকে আন। পায়ের ফাঁকে হাত দুইটি প্রবেশ করাইয়া ডান হাতে বাম হাতের কবজী

ধর। এই ভাবে স্থিত হইয়া একবার মাথা তোল এবং কোমর ও পায়ের দিক নামাও। এবং অন্যবার কোমর ও পায়ের দিক তোল এবং মাথা নামাও। এই ঘুংগী খেলা ব্যায়াম ১৫ হইতে ২৫ বার করিতে পারিবে। এই ব্যায়াম কালে প্রয়োজন হইলে মাথার নীচে বালিস ব্যবহার করিবে নয়তো মাথা ব্যথা হইতে পারে।

যদি অল্প সময়ে ব্যায়াম সম্পন্ন করিতে চাও তবে তারকা চিহ্নিত ব্যায়ামগুলি মাত্র করিবে।

## বিস্তারিত সঙ্কেতাসনার কথা

বিস্তারিত সঙ্কেতাসনা অর্থে বৈদিক সঙ্কেতাসনা বুঝিতে হইবে। আমরা সামবেদীয় উপাসনা বিধি এই পুস্তকে দিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু ক্ষুদ্র পুস্তকে এই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উপাসনার সব বিজ্ঞান ও যোগের ইঙ্গিত আলোচনা অসম্ভব। তাই আমাদের ইচ্ছা রহিল আমরা সেই সম্বন্ধে একথানা স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিব। যাহারা বিস্তারিত সঙ্কেতাসনা করিতে ইচ্ছুক তাহারা যে কোন সঙ্ক্যার বই দেখিয়া করিতে পারিবে। সর্বত্র ঐরূপ পুস্তক অল্প মূল্যে প্রাপ্য।